প্রবাদটি কোমৎ ও তাঁহার বিখ্যাত অনুচর বক্লের। ইঁহাদের মতে ভৌগোলিক সংস্থান অর্থাৎ কোনও দেশ পার্ব্বত্য, সমুদ্র সন্নিকট, মরুভূমি তলস্থ, নদীমাতৃক প্রভৃতি বিশেষত্ব অনুসারে জাতীয় উৎকর্ষতা সাধিত হয়। ইহা ছাড়া খাদ্য প্রাচুর্য্য ও অপ্রাচুর্য্যও উন্নতি বা অনুন্নতির কারণ। যেমন আরব ও মিসরীয় জাতি উন্নত নহে, তাহার কারণ সেখানে খেজুর যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, কাজেই সেখানকার লোক আহার সংগ্রহের জন্য অধিক বুদ্ধি ব্যয় করে না এবং বুদ্ধি ব্যয় করেনা বলিয়া তাহারা নির্ব্বোধই থাকে, কাজেই উন্নত হইতে পারে না।

সমাজ সমস্যা অতি জটিল এবং বুদ্ধিজীবী সমাজতত্ত্ববিৎ বলিয়া থাকেন যে সামাজিক ক্রিয়া বহু কারণ সমন্বিত, ইহাতে একদিকে জড়ের প্রভাব ও অপর দিকে চিত্তের প্রভাব রহিয়াছে এবং তাহা বড় বৃক্ষের শিকরের মত পরস্পর এতই মিলিত যে উহা বাছিয়া লইয়া মূল ঠিককরা বড়ই কঠিন।

মানবজীবন প্রবৃত্তিমূলক তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রবৃত্তিটা কি তাহা বলা হয় নাই। স্নেহ, প্রেম, যৌথবৃত্তি বলিলে আমরা নিজের মানসিক অবস্থাটা বুঝিতে পারি কিন্তু উহাদের স্বরূপ অবস্থাটা বুঝিতে পারিনা। ইহাদের মূল সম্পূর্ণ ভাবে প্রকৃতির আড়ালে। কোন কোন মনস্তত্ত্ববিৎ স্বতঃবৃত্তিগুলাকে মাধ্যাকর্ষণের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এক জড়-কণার মধ্যে এমন কি গুণ আছে যাহা অপর জড়কণাকে টানে তাহা আমরা যেমন কিছুই জানি না সেইরূপ স্নেহ প্রভৃতি এক একটা জীবের গুণ আমরা বুঝিতে পারি উহা দ্বারা একটা প্রেরণা (ইম্‌পল্‌স) হয় তাহাও বুঝি আর কিছু বুঝিবার সামর্থ্য মানুষের নাই। সম্ভবতঃ স্বতঃ-প্রবৃত্তি একটা অন্ধ শক্তি, এবং জীব ও মানব সমাজে আমরা যে সকল দৃশ্য ও ব্যাপার দেখিতে পাই উহা তাহার কারণ। মানবের জ্ঞান বিজ্ঞান মানবের কৌতূহল হইতে আর এই কৌতূহল আছে বলিয়া আমরা জগৎরহস্য বুঝিতে চেষ্টা করি। প্রকৃতির এটা অনুগ্রহই বলিতে হইবে যে উহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিলে সে নিজের দুয়ার খুলিয়া দেয়। যদি সে নিয়ম না থাকিত তাহা হইলে হাজার চেষ্টা করিলেও আমরা উহার শৃঙ্খলা বুঝিতে পারিতাম না। প্রকৃতি মনকে নিজের অন্তরের কথা বুঝিবার জন্য বোধ হয় ঐরূপ ভাবে সাজাইয়া দিয়াছে।

তবে প্রকৃতি সকলের সমান নহে, ইহার তারতম্য আছে। বুদ্ধি যেমন সকলের সমান নহে তেমনি প্রবৃত্তি সমূহেরও ইতর বিশেষ আছে। কাহারও ধনলিপ্সা কৌতূহল অধিক কাহারও বা কম। আবার প্রবৃত্তিবিরোধও আছে। কেহ ঘোর সংসারী অর্থাৎ তাহার স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি প্রবৃত্তি খুব প্রবল, আবার কেহ সংসার বিরাগী অর্থাৎ তাহারা স্নেহ, প্রেম, কাটাইয়া অপর কোনও ভাব লইয়া ব্যস্ত থাকে। ভাবরাজ্যে দেখা যায় কেহ স্বদেশপ্রেমিক আবার কেহ স্বদেশদ্রোহী। যাহারা স্বদেশদ্রোহী তাহাদের অধিকাংশ স্থলে ধনলিপ্সা অথবা প্রতিহিংসা বৃত্তিটা প্রবল হয়।

ভাবরাজ্যের আদর্শ অনেক বিরোধের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বুদ্ধ ও খৃষ্ট সংসার ত্যাগ করিয়া পরকালের চিন্তায় মানুষকে থাকিতে বলিয়াছেন। আবার এদিকে আমাদের দেশে চার্ব্বাক সম্প্রদায়, রোম প্রদেশে লুক্রিসস্, গ্রীক এপিকিউরিয়েনস্ ও পারস্যবাসী ওমারখাইয়াম্ ইহারা ইহ জগৎকে বড় করিয়া পরকালকে ছোট করিয়াছেন। আর আজকাল ইউরোপেও এই

ভাবটাই প্রবল। চার্ব্বাকদের "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ", লুক্রিসস্ ও এপিকিউরিয়েনসদের বার মাস সমান ভাবে সুখ অন্বেষণ" এবং ওমারখাইয়ামের "মস্‌জিদে সময় নষ্ট করা অপেক্ষা সরাবখানায় আমোদ করা ভাল" প্রভৃতি উক্তি ইউরোপে বেশ প্রতিফলিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইউরোপে তপ ও সন্ন্যাসের আদর ছিল কিন্তু নব অভ্যুদয় হইতে ইউরোপে সে প্রবৃত্তিটা আর নাই। আমাদের দেশেও বৃহন্নারদীয় পুরাণে যদিও "কমণ্ডলু বিধারণ" অর্থাৎ সন্নাস নিষেধ আছে কিন্তু জন সংঘ তাহা গ্রহণ করে নাই।

সাধারণ লোক প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াই চলে এবং প্রচলিত সামাজিক ভাবগুলাই তাহারা গ্রহণ করে। এই হিসাবে তাহারা অনুন্নত জাতি অপেক্ষা বিশেষ উন্নত নহে। তবে সভ্যতার আগমন সমাজে কি করিয়া হয়? সকলেই সাধারণ প্রবৃত্তির বশে চলিলে সমাজে এক ভাবেই থাকিয়া যায় উহার উৎকর্ষ সাধন হয় না উহা একবারে মৌমাছির সমাজের মত হইয়া পড়ে।

মানুষ প্রবৃত্তি অতিক্রম করিতে পারে না, তাহা হইলে সভ্যতারও প্রবৃত্তির সহিত একটা সম্বন্ধ আছে। গারো খাসিয়া, নাগা প্রভৃতি আদিম জাতিকে আমরা সভ্য বলি না কেন অথবা কেন তাহারা বর্ব্বর অবস্থায় আছে। তাহাদেরও কৌতূহল, অনুকরণ, স্নেহ, প্রেম, ধনলিপ্সা প্রভৃতি আছে, তবে তাহারা এরূপ হীন অবস্থায় কেন রহিয়াছে? সভ্যতার কারণ অনুসন্ধান করিলে বিশেষ কোন নূতন নিয়ম পাওয়া যায় না তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তবে সভ্যতার কতকগুলি আনুষঙ্গিক ব্যাপার আছে। মনুষ্য প্রবৃত্তির সমধিক বিকাশ যে জাতির মধ্যে হয় তাহাকেই আমরা সভ্য বলি। নব্য পাশ্চাত্য জাতিকে আমরা সভ্য বলি তাহার কারণ তাহাদের মানববৃত্তিগুলির বেশ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। বিজ্ঞান রাজ্যে তাহাদের বহু অধিকার ত আছেই, তাহা ছাড়া ভাবরাজ্যেও শিল্প, কলা, স্থপতি, সাহিত্য প্রভৃতি সুকোমল রসেরও তাহারা নূতন নূতন সৃষ্টি করিতেছে। তাহাদের জনসংঘ বোধ হয় পূর্ব্বের মত এক ভাবেই চলিতেছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে উন্নত শ্রেণীর লোকদের কৌতূহল বা নব অনুসন্ধান প্রবৃত্তি খুব অধিক ও সেই সঙ্গে শ্রম, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় গুণগুলি থাকায় তাহারা নূতন নূতন তত্ত্ব বাহির করিতে পারিতেছে। তাহাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থবল আছে, কাজেই অন্নচিন্তা তত নাই। মানুষের শক্তি যদি অন্ন বস্ত্রের জন্য অধিক ব্যয় করা হয় তাহা হইলে তাহাদের অপর দিকে বড় একটা টান থাকে না। আহারের ব্যবস্থা মানুষের আগে চাই এবং তাহাতে যাহাদের শক্তি ক্ষয় অধিক না করিতে হয়, স্বভাবের নিয়মানুসারে তাহারা অপরাপর প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে পারে। যে সকল বর্ব্বর জাতি ফল মূল অথবা বন্য জীব জন্তু ধরিয়া খায় তাহারা আহারের চেষ্টাতেই প্রায় সমস্ত দিনই থাকে এবং এই জন্য তাহারা অধিক আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিলে আর সহজে খাটিতে চায় না, তখন বিশ্রাম খোঁজে।

তবে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানবসমাজে প্রতিভাশালী ব্যক্তি সভ্যতার প্রধান উপকরণ। নূতন দিক, নূতন তত্ত্ব, নব পন্থা প্রভৃতি সাধারণ লোকে দেখাইতে পারে না, ইহাতে প্রতিভার আবশ্যক। যখন সমাজে যাবতীয় লোক সাধারণ বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি লইয়া চলে তখন সমাজ অবসন্ন ও অচল হয়। প্রাচীন সংস্কার, আচার ব্যবহার ভাব লইয়া সমাজ ঐ

অবস্থায় চলিয়া থাকে। ভাবপ্রবণ না হইলে সমাজ অগ্রসর হইতে পারে না। ধর্ম্মভাব, রাষ্ট্রীয় ভাব, নৈতিকভাব, এক ধারায় চলিলে সে সমাজ পশ্চাৎপদ সমাজ। জনসংঘ, জীববিশেষের প্রবাহবৎ চলে তাহাদের ভিতর ভাবের আবেশ করিয়া দিতে হয়। প্রতিভাশালী, সমৃদ্ধ, জ্ঞানী ব্যক্তির সমাজে কেন আবির্ভাব হয় তাহা সমাজতত্ত্ব হইতে জানা যায় না। তবে এরূপ কোন ব্যক্তির আগমন হইলে বুঝিতে হইবে যে, সমাজের কোনও একটা গলিত স্থানের সংস্কার হইবে অথবা কোন একটা নূতন প্রকৃতি রহস্য প্রকাশিত হইবে। মহাজনের আবির্ভাব অনৈমিত্তিক কিনা বলা যায় না; হয়ত ইহার কোনও নিয়ম শৃঙ্খলা থাকিতে পারে। যাহা হউক আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে "সম্ভবামি যুগে যুগে" এই প্রাচীন কথাটি সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারা যায়।

প্রত্যেক সভ্য জাতির এক একটা সময় এমন আসে যখন তাহাদের সমাজ মুক্ত হইয়া যেন ফুটিয়া উঠে। প্রাচীন মিসরে আমেনহোটেপের সময় মিসর জাতিটা বেশ জাগিয়া উঠিয়াছিল। গ্রীসে সোলন ও আলেক্‌সান্দারের শাসনকালে গ্রীক প্রবৃত্তি পূর্ণ মাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অগস্টস যুগ রোম্যান জাতির গৌরবের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। যে জাতি উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে তাহাদের গৌরবের একটা কাল আছে। সেই সময়টা তাহাদের যেন মানবীয় ভাবগুলা বিকশিত হয়। নবীন পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে সার্লমেন, ফ্রেডারিক, পিতর, লুই প্রভৃতির সময় সুপ্রসিদ্ধ। আবার এদিকে ইংলণ্ডে এলিজাবেথের সময় ব্রিটিশ জাতির কিশোর অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নিদর্শন ঐ সময়ের সুকুমার সাহিত্যে। উদ্যমশীলতায় ও ভিক্‌টোরিয়ার যুগ ত পৃথিবীর ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। আসিরিয়া ব্যাবিলন, প্রাচীন পারস্য, চীন ও আরব জাতিরও বেশ অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং তাহাদেরও সৌভাগ্যের যুগ আছে। প্রাচীন ভারতেরও একটা উন্নত সভ্যতা হইয়াছিল। যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, বশিষ্ঠ প্রভৃতি অনেক নূতন ধারা দেখাইয়াছেন। উপনিষৎ হইতেই বোধ হয় দর্শন ও ঈশতত্ত্বের সৃষ্টি তাহার পর বেদের ছয়টা অঙ্গ ত আছেই। দুঃখের মধ্যে ঐ সময়কার শিল্প ও কলাবিদ্যার সংবাদ ইতিহাস এখনও আমাদের দিতে পারে নাই। বৌদ্ধযুগে অশোকের সময় জ্ঞান, বিজ্ঞান, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি, (সাহিত্য, স্থপতি, কলা) প্রভৃতি অন্তরের প্রবৃত্তি গুলি বাহিরে সমপ্রভাবে স্ফুরিত হইয়াছিল।

আর একটা বিষয় দেখিবার আছে; মানব সমাজ মৌমাছিসমাজের মত একভাবী নহে। এক এক জাতির অভ্যুদয়ে জগত এক একটা নূতন সামগ্রী পাইয়াছে। শিল্প, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি ত সভ্যতার অঙ্গ, ইহার বহিস্ফুরণ প্রত্যেক উন্নত সমাজেই পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা ছাড়া আর একটা নূতন দিক বা নূতন ভাব প্রত্যেক সভ্যতার মধ্যেই আছে। যেমন প্রবালকজাল স্তরে স্তরে পড়িয়া গভীর সমুদ্র গর্ভ হইতে ধীরে ধীরে উঠে ও নূতন দ্বীপ সৃষ্টি করিয়া জীব ও উদ্ভিদের বাসভূমি হয় সেইরূপ জগতের প্রত্যেক সভ্যসমাজ এক স্তরের উপর দাঁড়াইয়া নিজেরা অপর এক স্তর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। মিসরীয় জাতির সভ্যতার প্রধান নিদর্শন বিরাট স্থপতি ও বর্ণবাচক চিত্রাক্ষর। আসিরীয় ও ব্যাবিলনের সভ্যতার স্তরে আমরা অক্ষরলিপি [illegible] জ্যোতিষের রাশি গণনা প্রভৃতি পাইয়াছি। ইতিহাসের বাণী অনুসারে আমরা

চীন জাতির নিকট হইতে মুদ্রাযন্ত্র, বারুদ ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য পাইয়াছি। মুসলমানদের (আরব ও পারস্য মধ্যযুগ) নিকটও মানব সমাজ অনেক বিষয়ে ঋণী। যখন ইউরোপ ও এসিয়া প্রদেশে জন সমাজ প্রাচীন মত, চিন্তা ও সংস্কার লইয়া চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতেছিল সেই সময় মুসলমানেরাই এসিয়া ও ইউরোপের সেতুস্বরূপ হইয়া উভয় স্থানের জ্ঞান আহরণ ও চর্চ্চা করিতেছিলেন। ঐ সময়ের ইতিহাসও মুসলমানেরাই নিখুঁতভাবে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আলবিরুনী গ্রীক ও হিন্দু জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া দুইই যথাসাধ্য স্বজাতির মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। অ্যাল্‌কেমী বা মূল রসায়ণ কতকটা মুসলমানেরই প্রতিভার ফল।

যাহা হউক প্রাচীন সমাজের মধ্যে হিন্দু ও গ্রীকেরাই বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। হিন্দু সভ্যতা যেমন এসিয়ায় আলোক বিস্তার করিয়া চীন, জাপান পারস্য প্রভৃতি দেশে নূতন ভাব দিয়াছে সেইরূপ গ্রীকজাতির জ্ঞানে নব্য ইউরোপীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। গ্রীকজাতির যদিও ধর্ম্মের দিকটা বড়ই ক্ষুদ্র ছিল কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে গ্রীক সভ্যতা বেশ সমুন্নত। গতি ও পদার্থ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানরূপে বোধ হয় গ্রীকেরাই জগতকে দিয়াছে। আরকিমিদিস্ ও পাইথাগোরাস্ হিন্দুজাতির কণাদ ও নাগার্জ্জুনের মত বিজ্ঞানের স্রষ্টা। হিন্দুরা প্রকৃতির নিয়ম অনুসন্ধানটা বড় ভালবাসিতেন না, প্রকৃতির মূল রহস্যটার দিকেই হিন্দুজাতির টান কিছু বেশী। গ্রীকদের বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসাটাই ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, আর হিন্দুদের ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা এসিয়ায় মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুরা কণাদ-মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিলেন না, জড়-রহস্য ফেলিয়া দিয়া জড়ের পিছনের রহস্যে আকৃষ্ট হইলেন।

গ্রীকজাতি স্থপতি ও ভাস্কর্য্যে পৃথিবীতে একটা নূতন ধরণ দেখাইয়া গিয়াছেন ; তাঁহাদের দর্শনও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন। গ্রীক-সভ্যতা এতই সমুজ্জ্বল যে রোমক সভ্যতা তাহার নিকট নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রীকপ্রতিভা যাহা প্রসব করিয়াছিল রোমকজাতি তাহারই পরিচর্য্যা করিয়াছে। তবে সাম্রাজ্য বৃদ্ধি হওয়ায় রোম রাষ্ট্রনীতিতে বেশ নিপুণ হইয়াছিল। রোমের ব্যবস্থা-তন্ত্র (আইন) সভ্য জগতে একটা আদরের জিনিস। গ্রীক ও রোম স্বীয় কঙ্কাল দ্বারা যে জ্ঞান-স্তর নির্ম্মাণ করিয়াছেন নব্য ইউরোপ তাহার উপর দাঁড়াইয়া আধুনিক সভ্যতা রচনা করিয়াছে।

হিন্দু জাতির মানসিক প্রবৃত্তিটা প্রকৃতির পশ্চাতে। তাঁহাদের ছন্দ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ বৈদিক তত্ত্ব অনুষ্ঠানের জন্য। সঙ্গীত ও নৃত্য দেবতা তুষ্টির জন্য এবং ভাস্কর্য্য ও স্থপতি দেবতা ও দেবালয় রচনার অনুরোধে। এমন কি তাঁহাদের দর্শনও মোক্ষ ও অপবর্গ লাভের জন্য। বোধ হয় এই কারণই আমাদের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের মধ্যে আরিস্ততল বা টলেমির ভাগ কম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও শঙ্কর ভূত বিশ্লেষণে ব্যস্ত ছিলেন না, "যস্মাদ্বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" উঁহারই ধ্যানে ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

অতএব প্রত্যেক সভ্যতার এক একটা বিশেষ ধরণ আছে। প্রত্যেক সভ্য জাতিই অপর কোন সভ্য জাতির নিকট ঋণী। এক জাতির দ্বারা মানুষের যাবতীয় জ্ঞান সঞ্চিত হইতে পারে না। অক্ষর ও সংখ্যা রচনাতেই মানুষের বহুযুগ গিয়াছে। যদি কেহ মনে করেন যে ইউরোপীয় সভ্যতাই মানব সভ্যতার চরম তাহা হইলে [illegible]

অযৌক্তিক। যদি পৃথিবীতে মানুষ পঞ্চাশ হাজার বা একলক্ষ বৎসর আসিয়া থাকে তাহা হইলে মানুষের প্রবৃত্তি-চালিত জ্ঞান এতদিন ধরিয়া নূতন নূতন পথ দেখাইয়া আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আনিয়াছে। পৃথিবী সৌরমণ্ডলে কতদিন থাকিবে তাহা কে জানে? এখনও যে কতলক্ষ বৎসর কত যুগ ও যুগান্তর অতিবাহিত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। এতকাল ধরিয়া মানব-প্রবৃত্তি কি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে। আরও কত সভ্যতা ও কত জ্ঞান আসিবে তাহার সীমা নাই। অতীতের ঘটনার কতকটা আভাস পাওয়া যায় কিন্তু ভবিষ্যতের দৃশ্য প্রহেলিকাময়।

নব্য ইউরোপীয় সভ্যতা প্রকৃতি-রহস্য ঘাঁটিয়া অনেক প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কারের অসারতা দেখাইয়া দিয়াছে। প্রাচীন সৃষ্টিবাদে আর কেহ বিশ্বাস করে না। সূর্য্যকে শত শত জাতি দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়াছে, কিন্তু উহা এখন গলিত উদজান পিণ্ড। বজ্র এখন কোনও দেবতার অস্ত্র নহে উহা জড়ের ক্রিয়া মাত্র। আবার এদিকে কতকগুলি পরিত্যক্ত বিশ্বাসও আবার ফিরিয়া আসিতেছে। ইউরোপ এখন প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করে। বশীকরণ (হিপ্‌নটিসম্) ব্যাপার এখন ত সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে; এখন অনেকে দিব্যজ্ঞানে (১) বিশ্বাস করেন। ইউরোপীয় সভ্যতা যে স্তর রচনা করিতেছে তাহা খুব উচ্চ। হিন্দুরা মোক্ষকেই মানবজীবনের প্রধান লক্ষ্য স্থির করিয়াছেন, মোক্ষই মানবজীবনের চরম উন্নতি। খ্যাতনামা দার্শনিক লাইবনিজ বলেন, আমাদের বংশপরম্পরায় অগ্রসর হইতে হইবে, উন্নতির (প্রোগ্রেস্) দিকে চলিতে হইবে ইহাই মানবের লক্ষ্যের বিষয়, ইহাই মানব জীবন। উভয় মতেরই মূল্য আছে, উভয়ই দার্শনিক রহস্য, মানুষ যখন নিজেকে চিনিয়াছে তখন তাহার একটা কর্ত্তব্য আছে, তাহার স্থান বুঝিয়া লইতে হইবে। নবীন পণ্ডিত বার্গসোঁ ও অয়কেন মানুষকে "কর্ত্তব্য" লইয়া চলিতে বলিতেছেন। কিন্তু সে কর্ত্তব্যটা কি, কে জানে। প্রোগ্রেস্ আপনি হয়, না মানুষে করে এইটিইত সমস্যা।

নব্য সভ্যতার একটা বিশেষ লক্ষণ আছে, জনসংঘ (মাস্) চিরকালই দেব, ঋত্বিক, রাজা ও ধনসম্পদের সেবা করিয়া আসিতেছে। এখন কিন্তু সে ভাবটা আর বড় নাই। রবার্ট আউয়েন হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ল মারকস্ ও লেলিন অবধি সকলেই জনসংঘের পুরোহিত হইয়া তাহাদের কল্যাণ কামনা করিতেছেন ও অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। আর একটা বিশেষত্ব এই, যে কয়েকটি কারণে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া আজকাল ভাবের আদান প্রদান চলিতেছে এবং তাহার ফলে মানব মনের সংকীর্ণতা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়া যেন এক বিশ্বমানবের সৃষ্টি হইতেছে। ভবিষ্যতে ইহা হইতে মানুষের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা ব্যাপ্য ব্যাপক প্রণালীর দ্বারা বুঝা যায় না। মানুষের ভাবের (সেনটিমেণ্ট) পরিবর্ত্তন হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে যজ্ঞে নানাবিধ পশুবধ ও সুরা প্রচলিত ছিল, মৃত্যুর পর সমাধি প্রচলিত ছিল, অসবর্ণ বিবাহের বিধান ছিল, আদিম জাতির মধ্যে যত প্রকারের বিবাহ প্রচলিত আছে প্রাচীন সমাজে তাহার অনুমোদন ছিল। কিন্তু ভাব পরিবর্ত্তনের সহিত উহা আর চলে না। ভাবের কোনও জানা নিয়ম নাই, উহা কখন আসে এবং কখন যায় তাহা

(১) Clair Voyance.

ধরিবার উপায় নাই। আর একটা কথা আদিম সমাজে একটা ভাবের অভাব দেখা যায় কিন্তু উহা সভ্য সমাজে বেশ শিকড় গাড়িয়াছে। সেই ভাবটা লজ্জা বা ইংরাজী ভাষায় মডেস্‌টি। আদিম মনুষ্য সমাজে ইহা নাই বলিলেই হয়, সেই জন্য তাহাদের কাপড়ের এত সরঞ্জাম নাই, সভ্য সমাজে লজ্জা আছে, তাই আচ্ছাদনের উপর আচ্ছাদন। এ সকল কথার তাৎপর্য্য এই যে মানুষ যতদিন পরের সুখে কাতর হইবে, পরস্ব, নিজস্ব করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিবে, অপরকে ঠকাইয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধির বিষয় ভাবিবে ততদিন পৃথিবী এই ভাবেই চলিবে। "মা হিংস্যাৎ" "যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ম্ মম" এই দুই ভাবে মানব সমাজ যতদিন অনুপ্রাণিত না হইবে ততদিন পৃথিবীতে এক জাতিই থাকুক বা বহু জাতিই থাকুক সামাজিক ব্যাপার এই ভাবেই চলিবে। কাজেই বলিতে হয় জগতে মানুষের কৃতিত্ব কিছুই নাই অপরাপর জীব যেমন জগৎ শৃঙ্খলে একটা বেষ্টনী; মানুষও অনেকটা তাহাই। ভাবের পরিবর্ত্তন লইয়াই মানুষ, এবং সেই জন্যই জগৎকর্ত্তাকে আমরা ভাবময় বলিয়া থাকি।

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

কালের দাবী।

প্রতীচ্য-গৌরব-স্পর্দ্ধা, অতীতের হে পূজ্য-ব্রাহ্মণ,
ছিলে তুমি একদিন ধরণীর নরোত্তম
অনুপম
ত্যাগী তপোধন!
উষার উদয়সম আদিম প্রভাতে অদ্বিতীয় প্রতিভা তোমার
বিদূরিয়া দিয়াছিল নবীন কিরণে মানবের মোহ-অন্ধকার!
দর্শনে বিজ্ঞানে জ্ঞানে গভীর মনীষা—জ্যোতিষ্মান্! দিয়াছিল আলি,
আসমুদ্র-হিমাচল-নিখিল ভারতে দীপ্তিশালী অপূর্ব্ব দীপালী!
ব্রহ্মজ্ঞানে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, তব মন
দুর্লভ তপস্যাতেজে উজ্জ্বল করিয়াছিল অরণ্য-আশ্রম তপোবন!
আলোড়িয়া পঞ্চভূত প্রকৃতির সৃষ্টি-মায়া-জাল
মথিয়া ত্রিকাল
জন্ম মৃত্যু জীবনের ঘুচায়ে প্রমাদ
অমৃতের বিচিত্র সংবাদ
সত্য শিব সুন্দরের সৎ-চিৎ-আনন্দ-ঘন বাণী
দিয়াছিলে আনি।

অসীমেরও পৌঁছিয়া সীমায়
মহামহিমায়
লভেছিলে তুমি একদিন
প্রতিদ্বন্দ্বীহীন
ভারতের সর্ব্বোচ্চ আসন!
তোমার শাসন
সেদিন মানিয়াছিল সেতুবন্ধ কুমারীকা হ'তে
গান্ধারে তিব্বতে
আদিযুগ পিতামহগণ!
ক্ষমতার সেই প্রলোভন
অন্তরের দুর্ব্বলতা করিয়া আশ্রয়
চেয়েছিলে অনন্ত বিজয়
অসবর্ণ জাতির উপরে চিরদিন!
নিয়তির নিয়ম কঠিন
সেই তব কলুষিত মনে
সঙ্গো-পনে
আনিল সেদিন
হীন পরাজয়!
বিষময়
তাহারই কুফলে
রসাতলে
ফেলিয়াছে টানি
সুমেরু শিখর হ'তে স্বর্গারূঢ় তোমাদের স্বর্ণচূড় সিংহাসন খানি।

হায় শাস্ত্রপাণি!
স্বার্থের চরণ তলে
পলে পলে
মহত্বেরে দলি
এসেছিলে চলি!
আজি সেই শূন্য-গর্ব্ব
বর্ণ-গর্ব্ব
জীর্ণ ছদ্মবেশ
চিনিয়াছে দেশ!

সহস্র বর্ষের তব অনুষ্ঠিত অন্যায়ের ক্লেদ
জাতির জীবন যজ্ঞে যুগ যুগ ধরি
আত্মশক্তি হরি
করিল যে নিষ্ঠুর নির্ম্মম নর-মেধ
স্বদেশে সমাজে ধর্ম্মে রাষ্ট্রনীতি পটে
সর্ব্বঘটে
আজি তাহা করিছে প্রকাশ
মহা সর্ব্বনাশ !
অগণিত নানা শাস্ত্রে অসত্যের রচি মায়া-ফাঁস,
সৃজিয়াছ যেই নাগপাশ—
আজি তার অস্বাস্থ্য বাতাস
নির্জ্জীব করিয়া দেছে এজাতির জীবনের শ্বাস !
হীনতম গোপন কৌশলে
প্রক্ষিপ্ত শাস্ত্রীয় শ্লোক, মিথ্যা মন্ত্র বলে
পূরাইতে আপনার কলুষ বাসনা
বিস্তারিলে পুরাণের অষ্টাদশ বিষধর ফনা !
আজি তার গরল দংশনে—
জর্জ্জরিত আর্য্যজাতি সমাজে ও মনে !
'স্রষ্টার বদন হতে সৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, দ্বিজ—
হেন কত রূপকথা বিরচিয়া প্রচারিলে দুর্ব্বিনীত অহঙ্কার নিজ!
শুনাইলে নারায়ণ বক্ষে ধরে পদ-চিহ্ন তব—
স্পর্দ্ধার চূড়ান্ত নব নব !
শূদ্রকের হত্যাকাণ্ড অসহায় রামের সহায়ে
তোমার হিংস্রমূর্ত্তি বীভৎস কঙ্কাল বহুকাল দিয়াছে দেখায়ে;
নিষ্ঠুর পরশুরাম,
মাতৃঘাতী পাতকীর নাম
স্বর্ণাক্ষরে রেখেছ লিখিয়া
সবার নয়নে যেন ছলনার মোহাঞ্জন দিয়া !
'—সমস্ত ক্ষত্রিয়গণে একাকী সে করেছে সংহার
একবিংশবার—'
হেন কত মিথ্যা ইতিহাস
করায়ে বিশ্বাস
জাগাইয়া জাতিগত ত্রাস
চেয়েছিলে ক্ষমতার ভয়াবহ বিভীষিকা করিতে প্রকাশ !

শস্ত্রচারী ক্ষত্রিয়ের গর্ব্বোদ্ধত পরাক্রম না পারি সহিতে অবশেষে
দারুণ বিদ্বেষে
তাদের হেরিতে হীনবল
বিস্তারিয়া ষড়যন্ত্র চক্রান্তের কুটিল কৌশল
কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ ঘটায়েছো সুদূর দ্বাপরে
তারপরে
গর্ভাধান পুংসবন হ'তে শ্রাদ্ধ শান্তি সপিণ্ডকরণ
সকলের সবকাজে অন্ন, বস্ত্র, অর্থ, আভরণ,
হয় যাহা বিনাশ্রমে আয়,
করিয়াছ আজীবন তারই শুধু সহজ উপায়।
বিস্তারি সমুদ্র পথে নিষেধের কঠিন বাঁধন
সাধিয়াছ নির্ব্বিচারে অনাগত উন্নতির অসময়ে অন্ত্যেষ্টি সাধন।
অবনত অন্তরের সেই তব শীর্ণ সঙ্কীর্ণতা
সেদিন অযথা
বাণিজ্য বৈভব বিদ্যা বিজ্ঞানের আদান প্রদান
রুদ্ধ করি চিরতরে, অবিশুদ্ধ ঘোর অকল্যাণ
আনিয়াছে ডেকে ;
সেই দিন থেকে
আপনার প্রতিপত্তি অব্যাহত রাখিতে নিয়ত
রচিয়াছ কত
অবৈধ শাস্ত্রীয় বিধি বিধানের বিবিধ প্রাচীর
সবারে করেছে যাহা পরাধীন আজ, হীন-বীর্য্য, দীন নত-শির।
শাস্ত্র শিক্ষা, ব্রহ্ম-বিদ্যা বেদ
স্ববর্ণ ব্যতীত তুমি সবারেই করিয়া নিষেধ
চেয়েছিলে জ্ঞানরাজ্যে একছত্র নিজ অধিকার
তোমার সে প্রতারণা বিবেকের বিরুদ্ধ বিকার
ঘোর ধাপ্পা-বাজী
নিষ্ঠুর ধ্বংশের মাঝে আজি
পড়িয়াছে ধরা।
অকালে এনেছে ডেকে জরা
তোমাদের অত্যাচার অসত্যের ভণ্ড আচরণ,
হত্যা করি দেশের যৌবন!
মূঢ় অন্ধ বিশ্বাসের লভিয়া সুযোগ
অনায়াসে ভোগ

করিয়াছ করায়ত্ত, ভেবেছিলে মনে।
সেই মহা অশুভ কুক্ষণে
ক্ষমতার উচ্চ শৈলে বসিয়া সেদিন, ভাবোনাই একবার
তোমাদের নির্দ্ধারিত পাপপুণ্য হিসাবের ধার
ধারেনা যে আছে হেন জন
তোমাদের প্রবর্ত্তিত স্বর্গ মর্ত্ত্য নরকের বহু উচ্চে তাহার আসন!
সেদিন হেরিয়া অন্তর্যামী
তোমাদের প্রবঞ্চনা আচারের জঘন্য গোঁড়ামী
হেসেছিল মনে মনে একা!
হায়, যদি কোনও মতে সেদিন পাইতে তুমি দেখা
তোমাদের শোচনীয় এই বর্ত্তমান;
আতঙ্কে উঠিত কাঁপি প্রাণ।
বিনাশ নিশ্চিত জানি হয়ত হইতে সাবধান।
জ্ঞান বুদ্ধি বিবেকের করিতে না এতকাল প্রতিপদে এত অপমান
মানুষ হইয়া তুমি মানুষের প্রতি করিয়াছ যেই অবিচার
অনিবার্য্য পরিণাম তার
দুর্গন্ধ পঙ্কের মাঝে তোমারেও আনিয়াছে টানি।
জানি, ওগো, জানি—
ক্ষমতার করি ব্যভিচার,
আজি তুমি ভূপতিত, উপবীত সার—
বিবর্জ্জিত ব্রহ্মবিদ্যা, বেদ-বিধি ব্রাহ্মণত্বলেশ
সুকৃতির ভগ্নস্তূপ, দগ্ধ-স্মৃতি মহিমার, সাধনার ধ্বংস অবশেষ!
তপোভ্রষ্ট হে তাপস!
খুলে ফেল আজি তব জর্জ্জরিত নির্ব্বীর্য্য খোলস,
স্বার্থশূন্য আত্মজয়ী উদার প্রেমিক চিত্ত ল'য়ে
দাঁড়াও আজিকে এসে সবার মাঝারে এক হ'য়ে।
আপনার অযোগ্যতা করিয়া স্বীকার মুছে ফেল মিথ্যা অভিমান
অতীত গৌরব রত্ন ঋষি মনিষীর করিও না আর অপমান!
স্বদেশের মুখ চেয়ে—'সামুরাই' বীরবৃন্দ সম—
অনুপম
হৃদয়ের বলে
এস দলে দলে
বল, মোরা চাহিনা সে পূর্ব্ব-অধিকার—
ঐশ্বর্য্যের কণামাত্র যার

নাহি আর তোমাদের নিঃশেষিত দরিদ্র-ভাণ্ডারে।
সকলের দ্বারে
নামিয়া দাঁড়াও নির্ব্বিচারে,
বল দর্পভরে—
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কি চণ্ডাল সমান সকলে পরস্পরে!
অস্পৃশ্য, অধম, নীচ, জাতি, বর্ণ, ভেদ নাহি আর,
সকলের সব কাজে সবার সমান অধিকার,
অখণ্ড এ রাষ্ট্র পরিবার—
সবাই আত্মীয় আজ সব আপনার।
একই জননীর পুত্র একদেশ একজাতি সাহোদর সবে
পতিত এ ভারতের উন্নতি আবার সম্ভব হইতে পারে তবে।

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

বৈদিক বিষ্ণু ও কৃষ্ণ।

বেদ পাঠ না করিলে পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বোঝা যায় না, কারণ অনেক পৌরাণিক কাহিনীরই মূল বেদে। যেমন ক্ষুদ্র বীজ হইতে ক্রমশঃ বৃহৎ বৃক্ষ জন্মে, তেমনি বৈদিক ঋষিদের এক একটি কল্পনা হইতে, এক একটী কবিত্বপূর্ণ কথা হইতে, বড় বড় পৌরাণিক গল্প রচিত হইয়াছে। সেই যুগের এক এক জন ঋষি বা যোদ্ধা—যিনি কল্পিত কি ঐতিহাসিক তাহা নির্ণয় করা এখন আর সম্ভব নহে—তাঁহার সম্বন্ধে বেদে যাহা অতি সংক্ষেপে বলা হইয়াছে তাহা ক্রমশঃ এত বিস্তৃত ও জটিল হইয়া উঠিয়াছে, সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ স্থান সমূহের সঙ্গে তাহা এত জড়িত হইয়া গিয়াছে, যে তাহা এখন ঐতিহাসিক বলিয়া মনে হয়। এই প্রবন্ধে এবং ইহার পরবর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে এই সকল কথার কিছু প্রমাণ দিতে চেষ্টা করিব।

বিষ্ণু ও কৃষ্ণ এখন এদেশে ঈশ্বররূপে পূজিত। কিন্তু এই সম্মানের পদ পাইতে তাঁহাদের অনেক শতাব্দী, অনেক যুগ, লাগিয়াছে। বিষ্ণু বেদে, বিশেষতঃ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋগ্বেদে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেবতা। ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ। বিষ্ণু "ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা" (ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ২২শ সূক্ত)—ইন্দ্রের যুক্ত বা উপযুক্ত সখা। তাহা তো হবেনই। বৈদিক বিষ্ণু আর কেহই নহেন, তিনি সূর্য্য। আর ইন্দ্র মেঘ ও বিদ্যুতের দেবতা সূর্য্য বাষ্পাকারে জল আকর্ষণপূর্ব্বক মেঘ সৃষ্টি করিয়া ইন্দ্রের সহায়তা করেন। যাহা হউক,

এই যে সূর্য্যরূপী বিষ্ণু, যিনি খর্ব্বাকার বামন সদৃশ, তিনিই "ত্রিবিক্রম"। পুরাণে এই ত্রি-বিক্রম বা তিনটি পাদক্ষেপের এবং তদ্দ্বারা বলির ছলনার কতই না বর্ণনা! কিন্তু ঋগ্বেদে দেখা যায় এই ত্রি-বিক্রিম আর কিছু নহে, আকাশে সূর্য্যের তিনটি সংস্থান মাত্র। প্রত্যূষে সূর্য্য পূর্ব্ব দিকে চক্রবাল রেখার উপরে, মধ্যাহ্নে আকাশের মধ্যস্থলে, এবং অস্তগমনকালে পশ্চিম চক্রবাল রেখার উপরে থাকে। এই হইল বিষ্ণুর ত্রি-বিক্রম। বামনাবতারের বৈদিক গল্প শুক্লযজুর্ব্বেদের শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে। সে বিষয় পরে বলিব। ঋগ্বেদের "তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"—বিষ্ণুর সেই পরমপদ—যার অর্থ উপনিষদে দাঁড়াইয়াছে—ব্রহ্মের বিশ্বাতীত নির্গুণ স্বরূপ—তাহা আর কিছু নহে—মধ্যাকাশে সূর্য্যের অবস্থান মাত্র। যাহা হউক, ৭ম মণ্ডলের ৯৯তম ও ১০০তম সূক্তে আমরা আবার বিষ্ণুর দেখা পাই। এই সূক্তকারেরা তাঁহাকে অনেক বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তি হইতে বোঝা যায় কিরূপে তিনি ক্রমশঃ পরম দেবতার আসনে উন্নীত হইয়াছিলেন। গায়ত্রীতেও (১।১৬৪।৪৬) তাঁহার স্থান খুব উচ্চ, যদিও গায়ত্রীর বৈদান্তিক অর্থ তখনও কল্পিত হয় নাই। হংসবতী ঋক্ (৪।৪০।৫) সূর্য্য-বিষয়িণী কিনা সন্দেহ, কিন্তু যদি তাহাই হয় তবে বোঝা যায় যে কোন কোন মন্ত্র-রচয়িতা বিষ্ণুকে পূজ্যতম দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাভারত ও বৈষ্ণব পুরাণসমূহে তাঁহার যে স্থান, তাহা প্রাপ্ত হইতে কেবল অনেক সময় নহে, অনেক সংগ্রামও লাগিয়াছিল। সেই সংগ্রামের কথা বেদ পুরাণ উভয়েই আছে। ফলতঃ অবতারবাদ কল্পিত হইবার পূর্ব্বে এবং বিষ্ণুর প্রধান অবতার কৃষ্ণ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি সেস্থান প্রাপ্ত হন নাই। অবতারবাদ বৈদিক সময়ের অনেক পরে কল্পিত হয়, কিন্তু বিষ্ণু যেমন বৈদিক, যিনি পুরাণে বিষ্ণুর প্রধান অবতাররূপে অভিষিক্ত হইলেন সেই কৃষ্ণও বৈদিক। আমরা এখন বৈদিক কৃষ্ণের কথা বলি।

মহাভারত ও পুরাণের কৃষ্ণ ধর্ম্মাচার্য্য ও যোদ্ধা দুইই। বেদে দুই কৃষ্ণ, এক জন মন্ত্র-রচয়িতা ঋষি, আর এক জন যোদ্ধা। মহাভারত ও পুরাণে এই দুই বৈদিক কৃষ্ণ মিলিত হইয়াছেন। মহাভারতের কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়, কিন্তু অনার্য্য গোপকুলে প্রতিপালিত। বেদের ঋষি-কৃষ্ণ আঙ্গিরস অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ অঙ্গিরা ঋষির বংশোদ্ভব, কিন্তু যোদ্ধা কৃষ্ণ অনার্য্য। পৌরাণিক কৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের সদ্ভাব নাই, নানা স্থানে উভয়ে কলহ ও যুদ্ধ। বৈদিক অনার্য্য কৃষ্ণ ইন্দ্রের ঘোর শত্রু। কিন্তু বেদে ইন্দ্রের নিকট কৃষ্ণ পরাস্ত, পুরাণে সেই পরাজয়ের যথেষ্ট প্রতিশোধ,—প্রতিপদেই ইন্দ্র কৃষ্ণের নিকট পরাজিত ও অপমানিত। যাহা হউক, ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬শ সূক্তের ২৩শ মন্ত্রে এবং ঐ মণ্ডলেরই ১১৭শ সূক্তের ৭ম মন্ত্রে আমরা আঙ্গিরস কৃষ্ণের প্রথম দেখা পাই। এই মন্ত্রদ্বয়ের ঋষি কক্ষিবান্ বলেন, কৃষ্ণ এবং তৎপুত্র বিশ্বকায় বৈদিক দেবতা অশ্বিনদ্বয়ের উপাসক ছিলেন। বিশ্বকায়ের পুত্র বিষ্ণাপুর মৃত্যু হইলে অশ্বিনদ্বয় তাহাকে পুনর্জীবিত করেন। কৃষ্ণ পুরাণে ঐশী শক্তি সহ পুনরাবির্ভূত হইয়া নিজ গুরু সান্দিপনি সম্বন্ধে এই দৈব কার্য্যের অনুকরণ করিয়াছিলেন। সান্দিপনির পুত্র প্রভাসের নিকট সমুদ্রে পঞ্চজন নামক অসুরকর্তৃক হৃত হয়, কৃষ্ণ সেই অসুরের হাত হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনেন। যাহা হউক, ৮ম মণ্ডলের ৮৫তম সূক্তে পুনরায় আমরা

আঙ্গিরস কৃষ্ণের দেখা পাই। এই সূক্ত কৃষ্ণের নিজেরই রচিত এবং ইহার দেবতা সেই অশ্বিনদ্বয়ই। পরের সূক্ত কৃষ্ণপুত্র বিশ্বকের রচিত। বিশ্বক এবং বিশ্বকায় যে একই ব্যক্তি, তাহা এই দেখিয়া বোঝা যায় যে বিশ্বক এই মন্ত্রে নিজ পুত্র বিশ্বাপুর উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার জন্য অশ্বিনদ্বয়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। যাহা হউক এই আঙ্গিরস কৃষ্ণকে আরো কয়েকটি সূক্তে এবং মন্ত্রযুগের অবসানে সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা পুনরায় দেখিতে পাই। ছান্দোগ্যে তিনি "দেবকী-পুত্র" এবং আঙ্গিরসবংশীয় ঘোরনামক ঋষির শিষ্য। সে বিষয়ে আমরা পরে বলিব। এথন অনার্য্য যোদ্ধা দ্বিতীয় কৃষ্ণের কথা বলি।

ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডল, ৯৬তম সূক্তে তাঁহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সূক্তের ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ মন্ত্রে একটি যুদ্ধ বর্ণিত আছে। তার এক পক্ষে ইন্দ্র, অপর পক্ষে কৃষ্ণ। স্থান অংশুমতী নদীতীর। "অংশুমতী" বোধ হয় কাবুল নদীর প্রাচীন নাম। কৃষ্ণ দশ সহস্র সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে আসেন। এই সেনা যে অনার্য্য ছিল তার প্রমাণ এই যে ইহাকে ঋগ্বেদে "অদেবীঃ" অর্থাৎ দেবপূজা-বর্জ্জিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইন্দ্র বৃহস্পতির সাহায্যে এই সেনাকে বিনষ্ট করেন। এই বেদোক্ত ইন্দ্র-কৃষ্ণের যুদ্ধই পুরাণোক্ত ইন্দ্র ও কৃষ্ণের সমুদায় বিবাদের মূল। পৌরাণিকেরা বৈদিক দেবপূজার স্থলে কৃষ্ণপূজা প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান। কাজেই কৃষ্ণকে অন্ততঃ কতক পরিমাণে বৈদিক প্রধান দেবতা ইন্দ্রের বিরোধী না করিলে হয় না। দুটীমাত্র বিরোধের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করি। প্রথমটী বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন-পূজা উপলক্ষে। গোপেরা ইন্দ্রপূজা করিতে চায়। কৃষ্ণ বলিলেন ইন্দ্র কৃষিজীবী আর্য্যদের দেবতা। আমরা কৃষিজীবী নই, আমরা পশুজীবী গোপ। সুতরাং ইন্দ্রের পূজা না করিয়া আমাদের সেই গিরির পূজা করা উচিত যিনি আমাদের গো-বর্দ্ধন, গোর আহারদাতা। তার পর কি হইল তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। পৌরাণিক কৃষ্ণের মধ্যে যে অনার্য্য উপকরণ আছে তাহা এই গল্প হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়। কোনও খাঁটি আর্য্য নেতা দেবরাজ ইন্দ্রের পূজার বিরোধী হইতে পারেন না। গোপেরা যে পশুজীবী অনার্য্য ছিল তাহাও এই গল্প হইতে বোঝা যায়। ইহার আরো অনেক প্রমাণ আছে। যাহা হউক্‌ দ্বিতীয় বিবাদ পারিজাত-হরণ উপলক্ষে। এই বিবাদে এক পক্ষে ইন্দ্র ও অন্যান্য বৈদিক দেবতা, অপর পক্ষে কৃষ্ণ ও তাঁহার সেনা। জয় অবশ্য কৃষ্ণপক্ষেই হইল। ইন্দ্র-কৃষ্ণ-বিবাদের আদি ও অন্ত আমরা কতক বলিলাম। ইহার এক মধ্য আছে—যে সময়ে বিষ্ণু অন্য বৈদিক দেবতা হইতে বড় হইবার চেষ্টা করেন। তখন ইন্দ্রের ইঙ্গিতে বিষ্ণুর শিরশ্ছেদ হয়। সেই গল্প আছে শতপথ-ব্রাহ্মণে। সময়মত তাহা বলিবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

গয়ার ইতিহাস।

গয়ালী—

গয়ার ইতিহাস লিখিতে হইলে গয়ালী বা স্থানীয় হিন্দু পাণ্ডাগণের একটা সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত না লিখিলে ইহা সম্পূর্ণ অঙ্গহীন থাকিয়া যায়। গয়ার প্রাচীন ইতিহাসে ইহারা খুব জলন্ত যুদ্ধ বিগ্রহের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। প্যালেষ্টাইন যেমন পাশ্চাত্য দেশের খৃষ্টান ধর্ম্ম উপাসকগণের ক্রুসেডের পরিচয় দিয়া মধ্য যুগের ইতিহাস পৃষ্ঠাকে জলন্ত স্বর্ণ অক্ষরে জাগরুক রাখিয়াছে, সেইরূপ গয়াক্ষেত্র হিন্দুগণের জলন্ত ক্রুসেডক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার বিবরণ পরে লিখিব। এই ইতিহাসের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে হইলে গয়ার গয়ালীগণের বিষয় কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

যেমন মথুরার চৌবেগণ তীর্থপুরোহিত হইতেছেন সেইরূপ "গয়ালীগণ গয়ার তীর্থব্রাহ্মণ হইতেছেন। এখন গয়ালী ঘর সকল প্রায়ই নির্ব্বংশ হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের বংশবৃদ্ধির পক্ষে প্রধান অন্তরায় যে প্রথম বিবাহিতা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে ইহাদের কুলপ্রথানুযায়ী আর দার পরিগ্রহ করার বিধি নাই এবং কন্যা পাওয়াও দুর্ঘট। কয়েকটি গয়ালী ঘর বেশ সম্ভ্রান্ত, বর্দ্ধিষ্ণু ও ধনী। গয়ালীদিগের মধ্যে অধিকাংশই অলস এবং অসচ্চরিত্র বিশিষ্ট। এইখানকার মধ্যে ৺ ছোটে লাল সিজোয়ার, নারায়ণলাল মাহতা, ৺ রামহরি টেঁড়ী, ৺ বিহারিলাল বারীক রায় বাহাদুর, রায় বলদেবলাল নাকফোফা বাহাদুর, ৺ বলদেবলাল খড়্‌খোঁবা, ৺ নানকুলাল মৌয়ার, ৺ মোতীলাল সেন, ৺ বলদেবলাল টাটক (নেপাল-রাজের তীর্থগুরু), ৺ বলদেবলাল চারিয়ারি, কমলা প্রসাদ আহীর, দুখীলাল মৌয়ার, কৃষ্ণলাল ধোকড়ী, বুল্লকলাল ভীখম ভাইয়া, প্রভৃতি গয়ালীগণের গৃহ বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং প্রখ্যাত। এই গয়ালীগণের নাম ধাম মিলাইয়া গয়ার যাত্রীগণ তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ কল্পিত গয়ার পাণ্ডার গৃহে উপনীত হইতে পারেন এবং সুলভে গয়াকার্য্য সমাধা করিতে পারেন। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটির জীবনী পরবর্ত্তী স্থানে লিখিত হইবে। গয়াশ্রাদ্ধ পূর্ণ অঙ্গ সমাপ্ত করিতে হইলে মোট ৪৫ স্থানে পিণ্ডদান করিতে হয়। কেহ ২১৯ বেদীতে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন কিন্তু তীর্থমালার ১৬৪টি তীর্থ বেদীর নিদর্শন পাওয়া যায়। পিণ্ডদান ক্রিয়া সমাপনের পর তীর্থগুরু গয়ালীর পাদপূজা করিয়া "সুফল" লইতে হয়। সুফল না লইলে "গয়াকাজ" অছিদ্র ও সম্পূর্ণ হয় না। এই কারণে গয়ালীদের যাত্রীগণের উপর পীড়ন ও অর্থের নিমিত্ত অত্যাচারের অবসর ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বে গয়ালীগণ যাত্রীদের উপর অর্থের জন্য অত্যন্ত পীড়ন ও অত্যাচার করিত, কিন্তু এখন তাহা ক্রমশঃ দমিত হইলেও স্থানে স্থানে পীড়নের মাত্রা বড় কম নাই। গয়ালীগণ নিজেদের বাটীতে অথবা "অক্ষয়বট" তীর্থে দক্ষিণাদি লইয়া গয়া কার্য্যান্তে যাত্রীদের "সুফল" দিয়া থাকেন। অক্ষয়বট তীর্থে পিণ্ডদান ও পূজন করিলে পিতৃগণের অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। পঞ্চক্রোশের মধ্যে প্রথম শ্বেতবরাহ কল্পের প্রথম ত্রেতাযুগে ভগবান রামচন্দ্র গয়াশ্রাদ্ধ করিতে অত্রস্থানে

আইসেন বলিয়া রামায়ণ ও অন্যান্য গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। ব্রহ্মা যখন গয়াতীর্থ প্রথম করিত করেন তখন গয়ালীগণকে ৫৫ গ্রাম এবং প্রভূত স্বর্ণ রৌপ্যাদির পর্ব্বত দিয়াছিলেন। কালক্রমে গয়ালীদের লোভও দুর্ভাগ্যবশতঃ সবই নষ্ট হইয়াছে; এমন কি তাঁহাদিগকে প্রদত্ত ভূমিও পরহস্তগত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পরভূমিতে শ্রাদ্ধ করিলে তাহার ফলভোক্তা ভূস্বামীর পিতৃগণ হইয়া থাকেন, সেইজন্য গয়ার যাবতীয় বেদীতে গয়ালীগণ যাত্রীদের নিকট হইতে ৫ একপয়সা করিয়া ভূস্বামীর কর গ্রহণ করিয়া থাকেন। গয়ার মধ্যে সকল বেদীই "চৌদ্দসাহী পঞ্চের অধিকারভুক্ত হইতেছে। নিম্নে বেদীদের তালিকা এবং করগ্রহণের হার লিখিত হইল ঃ—

বেদী	অধিকারী	করের হার
উত্তর মানস	চৌদ্দসাহী	এক পয়সা
উদিচীকনখল	"	"
দক্ষিণ মানস	"	"
ধর্ম্মারণ্য	"	"
মাতঙ্গী	"	"
ব্রহ্মসরোবর	"	"
গদালোল	"	"
ভীমজানু	"	"
কাগবলী	"	"
গয়াশীর	"	"
গয়াগজ	"	"
সীতাকুণ্ড	"	"
তারক ব্রহ্ম	"	"
বড় অক্ষয় বট *	"	৫১০
ছোট অক্ষয় বট	"	৫
বিষ্ণুপদ	"	"
আম্রসেচন	"	"

গয়াকুপ এবং মঙ্গলা গৌরীর নিম্নস্থ গোপ্রচার তীর্থদ্বয় গয়ালীগণের ভোগপত্নী সন্তানদের বা সুরতওয়ালাদের হাতে ন্যস্ত আছে। ইহার আয় তাহারাই ভোগ করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি বেদী আছে তাহা কোন কোন গোয়ালীর স্বতন্ত্র অধিকারভুক্ত। যেমন—

জিহ্বালোল হিরালাল চৌধুরী

* ইহাই ব্রহ্মাকল্পিত আদি এবং প্রাচীন তীর্থ। ক্ষুদ্র অক্ষয় বট পর কল্পিত এবং ইহা গয়ালীগণের পয়সা রোজগার করিবার অন্যতম উপায় মাত্র। হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থে তথা গয়া মাহাত্ম্যে বা গরুড় ও বায়ুপুরাণে ছোট অক্ষয় বটের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ধৌতপদ *	শ্যামলাল গুপ্ত ও নারায়ণ লাল গুপ্ত	৵৫
আদি গদাধর	বাপুলাল বারিক	৵৫
আদি গয়া—	কানাইলাল মউয়ারের পুত্র (রামজী ও শ্যামজী)	৵৫
গায়ত্রী ঘাট	নরসিংহ লাল মাহতো	"
মুণ্ডপৃষ্ঠা	রামলাল ধোকড়া	৵৫
রামগয়া	বাপুজী ভৈয়া	"

গয়ালীগণ ফল্গু, বিষ্ণুপদ এবং অক্ষয় বট ছাড়িয়া অপর সকল তীর্থে ৵৫ করিয়া ভূস্বামীর কর নিজ ২ যাত্রীদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন। স্বতন্ত্র বেদীর কর বেদীপতি একাই গ্রহণ করিয়া থাকেন কিন্তু যেগুলি সাধারণ বেদী, তাহার নিয়ম এই যে, যে কয়জন গয়ালী আদায়ের সময় উপস্থিত থাকেন তাঁহারাই তাহা সমঅংশে বিভাগ করিয়া লন এবং এক অংশ বেদীর হয়, অর্থাৎ এই সর্ত্তাঙ্ক "বৃত্তি" হইতে বেদীর সংস্কার পূজাদি সমাহিত হইয়া থাকে। বেদীর দান বা কর গয়ালী ভিন্ন অপর কাহারও লইবার অধিকার নাই। যে যে বেদীতে যে যে গয়ালী উপস্থিত থাকিবেন তিনিই এই করের অংশ পাইবেন, ঘরে বসিয়া এই করের অংশ ভাগী কোন গয়ালী হইতে পারেন না। সকল বেদীরই বিভক্ত কর হইতে এক অংশ পূজা সংস্কারাদির জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। বিষ্ণুপদে সকল গয়ালীর ভিক্ষা করিবার অধিকার আছে। পাদপদ্মে যে "চড়াই" হয় তাহা উপস্থিত গয়ালীগণ ভাগ করিয়া লন, পিণ্ড দত্তকের গয়ালী বা তাঁহার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন তাহা হইলে তিনিই সমুদয় দান বা প্রদত্ত বৃত্তি পাইয়া থাকেন। এই থানে প্রত্যেক বঙ্গবাসীর নিকট হইতে ৵১০, দক্ষিণাত্য বাসীগণের নিকট হইতে ৵১৫ তিন পয়সা এবং অন্যান্য যাত্রীদের নিকট হইতে ৵১০ অর্দ্ধ আনা কর বা প্রবেশ-শুল্ক গয়ালীগণ আদায় করিয়া থাকেন। কুণ্ডের মধ্যে "চড়া" পয়সা যজমানের গয়ালী তথায় উপস্থিত থাকিলে তিনি সমুদয়ই পাইয়া থাকেন, নচেৎ মন্দিরে উপস্থিত অপর যাবতীয় গয়ালী তাহা সমাংশে ভাগ করিয়া লইতে পারেন। সন্ধ্যার পরের "চড়াই" গৌতম গোত্রীয় ভৈয়া গয়াপাল ছাড়া অপর কোন গয়ালী তাহা লইতে পারেন না; ইহার মুখ্য কারণ এই যে রাত্রি কালের দক্ষিণা, পূজা, ঠাকুর প্রণামী, চড়াই, চরণ পূজাদি যাহা প্রদত্ত হয়, তাহা কেবল মাত্র গৌতমগোত্রীয় ভৈয়া গয়াপালগণ পাইয়া থাকেন, যে হেতু যখন রিশাল ভৈয়া গয়াপাল চক্রান্ত করিয়া পূর্ণা চৌধুরাণী গয়াপালনীকে হত্যা করেন, তখন তিনি নর হত্যা পাপে লিপ্ত হওয়া প্রযুক্ত গয়াপালগণ একমত হইয়া তাঁহাকে এই রাত্রির "বিষ্ণুপদ" পূজার বৃত্তি দান করিয়া দিলেন। বিষ্ণুপদ, অক্ষয় বটাদি তীর্থে যাত্রীগণ ভূর্জ্জ্যোৎসর্গও করিয়া থাকেন; তাহার প্রাপ্য গয়াপালগণ পাইয়া থাকেন কেবল মাত্র তীর্থের প্রবেশ বৃত্তি যাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি তাহা "চৌদ্দসাহী" সাধারণ সমিতি গ্রহণ করিয়া সংস্কার পূজাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। চৌদ্দসাহী সমিতির কার্য্যকারক কর্ম্মচারীগণ পালানুসারে গয়াপাল সম্প্রদায় হইতেই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। এক কর্ত্তা থাকেন; তিনি কর্ম্মত্যাগের সময় অপর নির্ব্বাচিত সভ্যকে নিকাশ দিয়া

---

* এই বেদী লইয়া কিশুন লাল মেহরওয়ারের সহিত গুপ্ত এবং জরদার পাটনা হাইকোর্টে মোকর্দ্দমা হইয়া জরদা ও গুপ্ত জয়লাভ করিয়াছেন।

থাকেন। গয়ালীগণের কম্মগত বৃত্তি হইতেছে। যে গয়ালী কোন যাত্রীর প্রদত্ত সনন্দ বা পূর্ব্বপুরুষের নাম ধামের নিদর্শন স্বীয় পুস্তকে দেখাইতে পারেন তিনিই তাঁহার গয়ালীরূপে কল্পিত হইয়া থাকেন। ইংরাজ রাজ্যের প্রদেশে অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব কাল হইতে অদ্যাবধি আদালতে বহু মামলা মকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে তাহা বিশেষ পাঠ করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গয়াসহরের চতুর্দ্দিকে চারিটি ফটক বা তোরণ অতি প্রাচীন কাল হইতে বিরাজমান ছিল। এই চতুঃসীমার মধ্যে কোন মুসলমান বাস করিতে পারে না এবং মুসলমানগণ "আজান" দিতে পারেন না। গয়ার জমী "মহেরাস" ভুক্ত হইয়াছে, ইহার জন্য কাহাকেও কর বা খাজনা দিতে হয় না। চৌধুরীখানার জমী বিক্রয় হয় না। সম্বৎ ১৭৬৯ সালের একখানি প্রাচীন পূর্ব্বোক্ত মুরলীধর ও বিশাল চৌধুরী গয়ালীর নামীয় কবলা পত্র দৃষ্ট হয়; পরবর্ত্তী প্রায় ১০০ শত বৎসরের মধ্যে চৌধুরীখানার জমার কবলাদিপত্রে হস্তাক্ষরের নিদর্শন পাওয়া যায়। ইংরাজি ১৪০৩ হইতে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যোধপুররাজ যোধসিংহ যাত্রিদের উপর কর ৩০ টাকা সিক্কা করু দিল্লীর সম্রাটদের রহিত করান, এবং ১৮০৯ সালে বাদসাহ দ্বিতীয় সাহ আলমের ফার্ম্মান অনুসারে গয়াগত যাবতীয় যাত্রীর উপর বাৎসরিক ১৮৯১৪৲ টাকা সিক্কা যে নির্দ্ধারিত ছিল, তাহা রহিত করা হয়। ইংরাজ অধিকারের প্রথম অবস্থায় ও এরূপ সামান্য কর যাত্রীদের নিকট হইতে আদায় হইত। মিঃ ফ্রান্সিস গিলান্ডার এই যাত্রীকর আদায়ের কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার প্রদত্ত একটি ঘণ্টা গয়ার বিষ্ণুমন্দিরের নাটমন্দিরে ঝুলিতেছে; তাহা প্রত্যেক পথিক দেখিতে পাইয়া থাকেন। ভারতে লজিং হাউস টেক্সরূপে এখন পিল্‌গ্রীম একট্ মতে প্রতি যাত্রীর নিকট হইতে ১৲ করিয়া কর গয়ার মিউনিসিপালিটি আদায় করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বকালে প্রাচীন রাজাগণ কর্ত্তৃক দুইবার বিষ্ণুমন্দির সংস্কৃত ও নির্ম্মিত হইয়াছিল, ৺নৃসিংহ-দেব ও ৺পুণ্ডরীকাক্ষদেবের মন্দিরের গাত্রে দুইটি প্রস্তরফলক গ্রথিত আছে তাহা পরে বিবৃত করিব। প্রাতঃস্মরণীয়া ইন্দোররাজরাণী অহল্যাবাই এই মন্দির ১৭৮৭ সালে বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত করেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ৺বিষ্ণুপদের মন্দিরের পূর্ব্বাবস্থার স্থাপত্য দেবের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। গয়ার প্রখ্যাত গয়াপাল বাবু বালগোবিন্দ সেন মহারাজ ১৯০৫ সালে বিষ্ণুপদ মন্দিরের শিখরদেশে স্বর্ণনির্ম্মিত ধ্বজা সংস্থাপন এবং ১৯১৪ সালে বিষ্ণুর পাদপদ্মের চতুর্দ্দিকে রজতময় বেষ্টনী বা "হৌজ" নির্ম্মাণ করাইয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই সেনজি মহারাজ প্রাচীন গয়ানগরের উত্তর তোরণের সন্নিকট বাবু রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীর সম্মুখে বহু অর্থ ব্যয়ে এক দেবালয়, সদাব্রত ব্যবস্থা ভিক্ষাদান প্রতিষ্ঠা করিয়া পাঠশালাদি দিয়াছেন। বিষ্ণুপদ মন্দিরের দক্ষিণ যে সুন্দর ৺জগন্নাথদেবের মন্দির দৃষ্ট হয় তাহা গয়া-পালাগ্রগণ্য মদ্‌পিতৃবন্ধু ৺বিহারীলাল মেহরওয়ার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ৺গদাধর ঘাটের অব্যবহিত উত্তর যে সুন্দর নূতন প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট দৃষ্ট হয় এবং যাহার উপর শতসহস্র যাত্রী প্রবাস বাস কষ্ট বিস্মৃত হইয়া সহাস্য বদনে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে "ফল্গুতীর্থ" বেদীতে পিণ্ডদান করিয়া কৃত-কৃতার্থ মনে করেন তাহা গয়ার গয়ালীকুলমুকুট ও শিরোমণি ৺ছোটে লাল সিজুয়ার মহোদয়ের দ্বারা বহু অর্থ ব্যয়ে ১৮৯৫।১৮৯৬ সালে নির্ম্মিত হয়। গদাধরঘাট ৺রাণী অহল্যা

বাইর প্রত্যেয় দ্বারা এবং মুন্সীঘাট তদীয় মীর মন্সী ৮লছমন মন্সীর দ্বারা ১৮১৫।১৮১৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সূর্য্যকুণ্ডের ঘাট এবং চৌদিককার প্রাচীর ১৮৫০ সালে টিকারী রাজ মহারাজা মিত্রজীৎসিংহ বাহাদুর গয়া শ্রাদ্ধান্তে প্রাচীন গয়ানগর গয়াপালগণকে দান করিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। গয়ানগরের মুর্চ্চা মহল্যার অন্তর্গত প্রাচীন ৮কেশব দেবের প্রাচীন মন্দির গয়াপাল কুলগৌরবা শ্রীমতি আইনাদাই পাহাড়ীন্ বহু অর্থব্যয়ে পুনঃ সংস্কার করাইয়া ১৩১২ ফশলী সালে সদাব্রত, দান, পাঠশালা, ও পুজাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মুড়লী পাহাড়ের উপর যে মন্দির বহু ক্রোশ দূর হইতে গয়া নগরে আগন্তুক পথিকের নয়ন ও মন মুগ্ধ করে, তাহা শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ ৮গোপাল মিশ্র ভিক্ষালব্ধ অর্থে ১৮৮৪ সালে নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এই মুড়লী পর্ব্বতের উত্তর দিকে নিম্নস্থানে ভৈরব মন্দির এবং এই পর্ব্বত মধ্যে আকাশগঙ্গা পাতালগঙ্গা এবং উর্দ্ধে অগস্ত্যকুণ্ড প্রভৃতি তীর্থ অবস্থিত আছে, তাহা পরে বিবৃত করিবার ইচ্ছা আছে। ক্রমশঃ

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

বিপিন বাবুর কঃ পন্থা ?

সর্ব্বজন পরিচিত অসাধারণ বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় অগ্রহায়ণ সংখ্যা নব্যভারতে "কঃ পন্থা ?" নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহা পাঠ করিয়া আমরা ক্ষুব্ধ না হইয়া পারি নাই।

যখন কোন লোক স্বজনগণের উপর কোন কারণে বিরক্ত হইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়—আত্মীয়তা ভুলিয়া পরজনের ন্যায় আচরণ করিতে থাকে ; তখন তাহার রিপু বিশেষের দ্বারা আবৃত বুদ্ধির সমীপে সুবিচারের আশা করা যায় না। সে বুদ্ধি শুধু ঘরের ত্রুটির কথাই খুঁজিয়া বাহির করে, স্বজনগণের দোষ আবিষ্কার করিতেই ব্যস্ত হয়।

বিপিনবাবু বরিশাল হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিত্ব সম্পন্ন করিয়া আসিয়াই জাতীয় মহাসমিতির সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন ; ইহা অনেকেই জানেন। বরিশালে বিপিনবাবুর প্রতি অশিষ্টাচার প্রদর্শিত হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। ইহাতে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। মতভেদ হইলেই শিষ্টাচার বর্জ্জন করিতে হইবে, মান্য ব্যক্তির অপমান করিতে হইবে, ইহা আর্য্যপ্রথা নহে। রক্ত মাংসের শরীরে ইহাতে ক্রোধের উদ্রেক হইতে পারে, মর্ম্মবেদনা দুঃসহ হইতে পারে, কিন্তু আত্মঘাতী প্রবৃত্তি বিচক্ষণ ব্যক্তির হৃদয়ে কখনও স্থান লাভ করিতে পারে না। বিপিন বাবু কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করায় সাধারণকে তাঁহার দেশবাৎসল্যের প্রতি সন্দিহান হওয়ার সুযোগ তিনি দিয়াছেন বলিয়া আমাদের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে।

তিনি কোথায় দেশের পথ প্রদর্শক হইবেন, না এখন পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কঃ পন্থা ?' পাল মহাশয় বলেন, "কংগ্রেসের নূতন আইন কহিতেছেন

যে, বৈধ ভাবে এবং নিরুপদ্রবে স্বরাজ লাভ করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। স্বরাজটী চরম লক্ষ্য নহে। যদি তথাকথিত বৈধ উপায়ে ও নিরুপদ্রবে এই স্বরাজ মিলে, তবেই তাহাকে বরণ করিয়া লইব। অন্যথা এই উপায় ব্যতীত যদি স্বরাজ লাভ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে স্বরাজকে বর্জ্জনই করিয়া যাইব।"

সত্যই কি কংগ্রেসের নূতন আইন এইরূপ বলেন? স্বরাজ লাভ কংগ্রেসের চরম লক্ষ্য নয়—স্বরাজ লাভের উপায় বিশেষই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য, এইরূপ ব্যাখ্যা দার্শনিকের মস্তিষ্ক প্রসূত হইতে পারে। পরন্তু কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই উহা বুঝিবেন না, আর ইহাও বিশ্বাস করিবেন না যে, কোন একটী উপায়ের সাহায্যে স্বরাজ লাভ না হইলে স্বরাজকে বর্জ্জন করিয়াই যাইবেন। নাগপুর কংগ্রেসে স্বরাজ লাভের জন্য যখন যেরূপ উপায়াবলম্বন সমীচীন বোধ হইবে, তাহাই অবলম্বন করার প্রস্তাব কর্ত্তারা গ্রহণ করেন নাই, এরূপ উক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম হইল না। এ স্থলে বোধ হয় কর্ত্তা শব্দে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি কংগ্রেসে কি ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছায়ই প্রস্তাব গৃহীত হইয়া থাকে? লোকমতের অধিকার অপেক্ষা রাখে না? যদি লোকমতের দ্বারা প্রস্তাব গৃহীত হইবার নিয়ম থাকে, তবে কর্ত্তাদের স্কন্ধে দোষ দেওয়া চলে কি? যাহার প্রস্তাব লোকমতের সহানুভূতি লাভের যোগ্য হয় তাহাই গৃহীত হইতে পারে। আমার প্রস্তাব মূল্যবান মনে হইলেও লোকমত সমর্থন না করিলে ইহাই বুঝিতে হইবে, বর্ত্তমানে প্রস্তাবটি গ্রহণের যোগ্য নয়। কংগ্রেস চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় বৈধ ও নিরুপদ্রব আন্দোলন ভিন্ন পাশবিক বলের আশ্রয় লইয়া স্বরাজ লাভ সম্ভব নহে। "ঢাল নাই তরোয়াল হীন নিধিরাম সর্দ্দারদের" পক্ষে নৈতিক বলের শরণ লইয়াই স্বরাজ লাভ করিতে হইবে। তাই এই পথকেই সুনিশ্চিত পথরূপে অবধারিত করা হইয়াছে। এই পথে চলিয়া যদি সাফল্য না ঘটে, তবে অন্য উপায় অবলম্বনের কথা আসিতে পারিবে। শুধু নানাবিধ ঔষধের ব্যবস্থা করিলে রোগ সারিবে না--যে ঔষধের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হইবে, তাহা সেবন করিতে হইবে—রোগ, মুক্তির পথে না আসিলে অবশ্যই অন্য ঔষধ সেবনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। সেবন না করিয়াই এই ঔষধে কোন ফল হইবে না এ কথা বলাও যেমন জ্ঞানীর অযোগ্য এই ঔষধে ফল না হইলে আর কোন ঔষধ ব্যবহার করিব না, ইহাও তেমনই অজ্ঞানের গোঁড়ামী মাত্র। জাতীয় কার্য্যে শুধু নয়, সবকাযেই গোঁড়ামী পরিত্যাজ্য।

জাতীয় মহাসমিতি ভারতের জ্ঞানী গুনী বিদ্বান ও চিন্তাশীলগণের সম্মিলন ক্ষেত্র। উহাতে গৃহীত প্রস্তাব সকলেরই শিরোধার্য্য করা কর্ত্তব্য। উহা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রতিকূলে হস্ত প্রসারণ করা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। পথের কথা না তুলিয়া কংগ্রেস নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া স্বরাজ লাভের আনুকূল্য করিবার জন্য শক্তিধর বিপিন চন্দ্রকে এখনও আমরা শতবার অনুরোধ করি। আমাদের সাগ্রহ অনুরোধ কি সফল হইবে না?

"স্বরাজ বলিতে কি বুঝিব, তাহা আজিও ভাল করিয়া খুলিয়া বলা হয় নাই।" বিপিনবাবুর এ অভিযোগটী সত্য। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার অনুগামীবৃন্দ স্বরাজ শব্দের নানা ব্যাখ্যা

দিয়াছেন। যিনিই যে অর্থ করুন, স্বরাজ শব্দের সহিতই তাহার প্রকৃত অর্থ জড়িত আছে। স্বরাজ যে রাষ্ট্রীয় বস্তু বা আদর্শ ইহা অস্বীকার করিবার কাহারও সাধ্য নাই। যিনি যেরূপ ব্যাখ্যাই করুন স্বরাজ যে আত্ম-নিয়ন্ত্রিত রাজ্যকেই বলে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আত্ম-নিয়ন্ত্রিত রাজ্য বা স্বরাজ লাভ করাই ভারতবাসীর চরম লক্ষ্য। এই স্বরাজ সাধারণ তন্ত্র বা রাজতন্ত্র উভয়ই হইতে পারে। দেশের অবস্থা বুঝিয়া স্বরাজের পদ্ধতি নির্দ্দেশিত হইতে পারিবে তখনই, যখন পরহস্তগত শাসনভার ভারতবাসীর স্বাধিকারে আসিবে। ইহা নূতন কথা নহে। স্বরাজ কিরূপ হইবে তাহা খুলিয়া না বলিলেও পর হস্ত হইতে শাসনদণ্ড নিজ হস্তে আনিবার জন্য প্রয়াস অবৈধ নহে। অষ্ট্রিয়ার হস্ত হইতে ম্যাৎসিনী গ্যারিবল্ডী যখন ইটালীর উদ্ধার সাধন করেন, তখন স্বরাজ কিরূপ হইবে তাহা দেশবাসীদের সঙ্গে পূর্ব্বেই সুস্থির করিয়া লইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন নাই। অষ্ট্রিয়ার শাসনের উচ্ছেদের নিমিত্তই প্রাণপণ লড়িয়াছিলেন। যখন স্বতন্ত্রতা লাভ করিলেন, স্বরাজ লাভ হইল, তখন দেশীয় রাজকুমারকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া স্বরাজকে রাজতন্ত্রে পরিণত করিলেন। আমাদেরও স্বরাজ ব্যাখ্যায় সময়ক্ষেপ না করিয়া পরশাসনের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য সর্ব্বাগ্রে শক্তি প্রয়োগ করা সমীচীন। স্বরাজ লাভ হইলে তাহার প্রকার ভেদ আপনি হইয়া যাইবে। সেজন্য উদ্বিগ্ন না হওয়াই কর্ত্তব্য।

নানা কারণে দেশের লোক [illegible] হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বিপিনবাবুও স্বীকার করিয়াছেন। 'স্বরাজের অর্থ না বুঝিলেও সাধারণ লোক এইটুকু বুঝিয়াছে যে স্বরাজ হইলে আর ইংরাজরাজ থাকিবে না।" আমরা বলি আরও একটু বুঝিয়াছে ও আশা করিতেছে যে, তাহাদের নিজের রাজা হইবে। স্বরাজ লাভের জন্য সাধারণের এই জ্ঞানই যথেষ্ট। এই জ্ঞানের সাহায্যেই তাহারা দেশের স্বরাজ লাভের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ স্বীকার করিতে সমর্থ হইবে।

বিপিন বাবুর ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিগণেরই অনুপায়। তাঁহারা স্বরাজ মূর্ত্তি সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ না করিয়া কখনও কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে পারিবেন না। যতক্ষণ তাঁহাদের মনের মত স্বরাজ ব্যাখ্যা তাঁহারা না পাইবেন, কিছুতেই স্বরাজ কর্ম্মীদের কর্ম্মের বৈধতা ও আন্তরিকতা স্বীকার করিবেন না, বা তাহাদের কর্ম্মের সহায়তা করিবেন না। তাহার প্রমাণ আলোচ্য প্রবন্ধে আছে। পাল মহাশয়ের দুঃখ, স্বরাজ পন্থীরা কথায় কথায় হরতাল ও ধর্ম্মঘট করিতেছে, চারিদিকে সরকারের প্রতাপ চক্ষের উপর নষ্ট হইয়া যাইতেছে দেখিয়াও সরকার অসাধারণ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া আছেন। কঠোরতা অবলম্বন করিবার ইঙ্গিত ইহাতে যেন বেশ আছে মনে হয়। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের রুদ্রমূর্ত্তির কার্য্য দর্শনে আশা করি, তিনিও সুখানুভব করিতে পারিবেন না।*

ইংরাজ শাসন হইতে যে আমাদের স্বরাজ উৎকৃষ্ট হইবে না, তাহার প্রমাণ তিনি চাঁদপুরের ধর্ম্মঘটের বিবরণের মধ্য হইতে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। চাঁদপুরে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার

* দেখিয়া সুখী হইলাম এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পরে বিপিনবাবু গবর্ণমেণ্টের দমননীতি দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রতিবাদ স্বরূপ ম্যানিফেষ্টোতে দস্তখত করিয়াছেন।

হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল। "কংগ্রেস কমিটির সহি করা ছাড় পত্র ভিন্ন সরকারী কর্ম্মচারীগণ কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে নাই।" সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইবে। "সয়তানী ইংরাজ রাজের শাসনাধীনেও ভারতবাসীর যেরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, এই স্বরাজ পন্থীদের শাসনে তাহাও থাকে না।" ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়া এই স্বরাজ লাভ করিতে তিনি চাহেন না। ইংরাজ রাজত্বে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, ইহা যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্যষ্টির সমষ্টি যে জাতি তাহারও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ আছে? জাতি যেখানে স্বাতন্ত্র্য বর্জ্জিত সেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতার অর্থ কি? ইহা তার্কিকের তর্কজাল মাত্র। আমি ২টী হরিণ শিশু কিনিয়া একটাকে যদি শিকলে আবদ্ধ না করিয়া আমার বাগানের প্রাচীরের মধ্যে চরিয়া খাইতে ছাড়িয়া দিই, তবে সেই হরিণটা যদি বুক ফুলা-ইয়া বলে আমি ব্যক্তিগত পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছি, তাহা হইলে হাস্যকর হইবে কি না? ইংরাজ রাজের শাসনাধীনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কতটুকু আছে তাহা ভুক্তভোগীগণ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। ইংরাজরাজের যশ গান করিতে যাইয়া অযথা উক্তি দ্বারা দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা নিতান্ত নিন্দনীয়। চাঁদপুরের ঘটনায় আমরা এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে, স্বেচ্ছায় দেশবাসী নেতার আদেশ পালনে অভ্যস্ত হইয়াছে—দুঃখ যন্ত্রণা শির পাতিয়া লইতে শিখিয়াছে। সকল দেশেই জাতীয় স্বার্থ রক্ষার অনুরোধে নেতার আদেশ পালন করিতে যাইয়া লোকে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেয়। চাঁদপুরেও তাহাই হইয়াছে। তজ্জন্য নিখিল ভারতের স্বরাজ মূর্ত্তি কলঙ্ক-মণ্ডিত করিতে যাওয়া শক্তির অপব্যবহার মাত্র। স্বরাজ লাভ হইলে, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য পুষ্টি লাভ করিবে, কখনও ক্ষুণ্ণ হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত। তবে এ সত্য গোপন করা যায় না যে, সমাজবদ্ধ জীবের সমাজের কল্যাণের জন্য, শান্তি শৃঙ্খলার অনুরোধে, ব্যক্তিত্বকে অনেক সময় সঙ্কুচিত করিতে হয় না করিয়া উপায় নাই। স্বরাজ হইলে, যাহা স্বেচ্ছায় লোকে করে, পর রাজের অধীনে তাহা অনিচ্ছায় করে, ইহাই প্রভেদ। পররাজ প্রায় সর্ব্বদাই ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের বাধা জন্মায় স্বরাজ ব্যক্তিত্বের বিকাশ পথ প্রসারিত করিয়া দেয়। স্বরাজ পররাজের পার্থক্য এই খানে।

বিপিনবাবু ঘর ছাড়িয়া পরের ঘরে আশ্রয় লইয়াছেন, বর্ত্তমান স্বরাজ আন্দোলনের বিপক্ষে তাঁহার শক্তিশালী লেখনী ধারণ করিয়াছেন ইহা আমাদের দুঃসহ বেদনাদায়ক। যাঁহাকে বঙ্গের তিলক মনে করিয়াছিলাম তিনি আজ কোথায়? ইহা ভাবিতেও আমাদের কষ্ট হয়। ইচ্ছা হয় তাঁহাকে বলি, "এস হে, ফিরে এস, ঘরের ছেলে ঘরে। আর থেক না পরের ঘরে অভিমান করে।" তিনি আমাদের কথা শুনিবেন কি? এতদিনের অর্জ্জিত, মান প্রতিপত্তি যশোরাশি যে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহা কি তাঁহার চিন্তার বিষয় হইবে না? ভগবান তাঁহার সুমতি প্রদান করুন। তাঁহার মতন শক্তিমান নেতা প্রকৃতপথের সন্ধান লাভ করিয়া দেশমাতৃকার সেবায় আত্ম সমর্পণ করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করুন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

দুইদিক্ (৩)

(প্রধানতঃ নব্যভারতের কয়েকটী প্রবন্ধ স্মরণে লিখিত)

১ম। সর্ব্বতোভাবে দোষশূন্য বা গুণশূন্য জিনিষ জগতে নাই। ভারতীয় স্পর্শ বিচারেরও পক্ষ সমর্থন করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে দোষের ভাগ অত্যধিক। বর্ত্তমান আন্দোলনই তাহার প্রমাণ।

২য়। মানুষ মুগ্ধভাবে কোন কিছুর অনুবর্ত্তন করিলেই তাহাতে বাড়াবাড়ি আনিয়া ফেলে। অন্নে বস্ত্রে এমন কি বিদ্যায় পর্য্যন্ত বাড়াবাড়ি আছে। স্পর্শবিচারও ধর্ম্মবুদ্ধির বাড়াবাড়ি,—সুতরাং বিকৃতি। বিরাট গৃহে বৃকোদরের পাচকত্বে যে বহু ব্রাহ্মণও সংকৃত হইতেন না এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। সুবর্ণবণিক্ উদ্ধরণ দত্তের অন্ন পরিবেশনে ব্রাহ্মণগণও আসন ত্যাগ করেন নাই। আজিও ৺ জগন্নাথক্ষেত্রে অন্নবিচার নিষিদ্ধ। এদিকেও শিক্ষা রেল, ষ্টীমার ও অফিসের শাসনে স্পর্শবিচার আপনা হইতেই সংকুচিত হইতেছে। কিন্তু মূলতঃ জিনিষটী খারাপ নহে। অন্নে, বস্ত্রে স্বাতন্ত্র্যরক্ষা চিকিৎসাশাস্ত্রের বিধান। রুচিভেদের কথাও স্মরণীয়। জীবহিংসাশূন্য দেবগৃহে যে যুবক পালিত, মাংসবিক্রেতার অন্ন কিছুতেই সে গ্রহণ করিতে চাহিবে না। ধর্ম্মজীবনেও স্পর্শের প্রভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে—যীশুখ্রীষ্ট অপবিত্র স্পর্শ বুঝিতে পারিতেন, ধর্ম্মজীবনের যাঁহারা প্রথম সাধক তাঁহারাও অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অন্ন বিচার মানিয়া চলেন। স্পর্শ সম্বন্ধে এই বিচারটুকু সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কোন আন্দোলনেই ইহা নিরাকৃত হইবে না। আর না হইলেও ক্ষতি নাই, প্রীতিই যাঁহাদের তপস্যা তাঁহারা ব্যক্তিগত কারণে বাহিরের নিয়ম রক্ষা করিলেও সহৃদয়তায় সকলকেই আপন করিতে পারিবেন। ঘৃণাবুদ্ধির নিরসনই গান্ধীজীরও উদ্দেশ্য, বিচারবুদ্ধির নহে। তাঁহার ন্যায় ধীর ও সুবিবেচক ব্যক্তির পক্ষে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়া অসম্ভব।

১ম। অহিংস অসহযোগের দুরূহ মার্গে দেশশুদ্ধ লোককে আহ্বান করিয়া তিনি যে নিজেই বাড়াবাড়ি করিতেছেন, এবং ফলে বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলের উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া পড়িয়াছে।

২য়। সত্য সকলের জন্য, কোথায় রত্নাকরের মধ্যে বাল্মীকি লুকাইয়া আছেন কে বলিতে পারে? গুরুর আসনে যিনি উপবিষ্ট তিনিই অধিকার বিচার করিবেন, কিন্তু বিনয়ী ব্যক্তি যিনি সকলের নিকটই শিক্ষা করিতে প্রস্তুত তিনি সে উচ্চাসন গ্রহণ করিবেন কেন? গান্ধীজি কোন দিন তাহা করেন নাই,—তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যে পন্থাকে ফলপ্রদ বলিয়া জানিয়াছেন তাহাই বিশ্বাসের জ্বলন্ত ভাষায় লোকসমক্ষে প্রচার করিয়াছেন। জনসাধারণ তাঁহার লোকোত্তর চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া সেই পন্থার সমর্থন এবং বহু ক্ষেত্রে অনুবর্ত্তনও করিয়াছে। আর যদি কোথাও না করিয়া থাকে তাহাতেই বিস্ময়ের কথা কি আছে? অহিংসার মত কঠিন আর কিছুই নাই। প্রহার লাভের পর চুপ করিয়া থাকা অস্বাভাবিক। মনুষ্যের যাত্রা পশুত্ব হইতে দেবত্বের দিকে,—সেই গন্তব্য স্থানে যে মানুষ

পৌঁছে নাই তাহার পক্ষে প্রতিশোধপ্রবৃত্তি নিতান্তই সহজ ও স্বাভাবিক। এই প্রকৃতি ধর্ম্মকে অতিক্রম করিতে হইলে দীর্ঘসাধনার প্রয়োজন হয়। কেবল দুদিন গান্ধী মহারাজের জয়োচ্চারণ করিলে সে সাধনা সম্পূর্ণ হয় না। তাছাড়া এখানে গুরু শিষ্যে দেখা নাই, সাধনায় শিক্ষানবিশীর চেষ্টামাত্রও নাই। সুশিক্ষিত পুলিশ ও সৈন্য যখন সুপরিচিত নায়কের অধীনেও সকল সময় আত্মসংযম করিতে পারে না, তখন অশিক্ষিত জনসাধারণ নায়কহীন অবস্থায় যদি তাহা না পারিয়া থাকে তাহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে? এখানে গান্ধীজির দায়িত্ব মাত্রও নাই। এই যে সেদিন খৃষ্টান নামধারী কোটি কোটি লোক ধরাতল নর-শোণিতে প্লাবিত করিয়া দিল, তাহার জন্য কি যীশুখৃষ্ট দায়ী? তথাপি যে গান্ধীজি সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে লইয়া প্রায়োপবেশনের অনুষ্ঠান করেন তাহাতেই বুঝা যায় তাঁহার হৃদয়ের বিস্তার কতদূর। Distance lends enchantment to the View দূরত্বে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে। যীশুর অবতারত্বের কত অংশ দূরত্ব জন্য তাহা কে নির্ণয় করিবে? গান্ধীজী জীবদ্দশাতেই অবতার, তাঁহার সম্বন্ধে বলগাশূন্য জিহ্বায় কথা বলিতে নাই।

১ম। কিন্তু অবতারের যে বাক্য রক্ষাই হইলনা? ৩১শে ডিসেম্বর চলিয়া গেল, কোথায় বা স্বরাজ, কোথায় বা বন্দীদিগের কারামুক্তি।

২য়। স্বরাজ গ্রহণীয় নহে অর্জ্জনীয় বস্তু,—কর্ম্মিগণের তপস্যায় ও আমলাতন্ত্রের চণ্ডনীতির প্রসাদে আমাদের সেই অর্জ্জনশক্তি যদি আসিয়া থাকে তাহা হইলে ৩১এ ডিসেম্বর ব্যর্থ হয় নাই। যাঁহারা ভাবিয়াছিলেন বিনাসাধনায় স্বরাজ পাইবেন এবং ৩১এ উত্তীর্ণ হইয়া গেলেই নেতৃবর্গের প্রতি কটূক্তি করিতে বসিবেন তাঁহাদিগকে কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু সত্যই যাঁহারা কর্ম্মী তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন কথা বড়, না কল্যাণ বড়? বলবানের নিকট প্রেষ্টিজই বড়, স্বয়ং যুধিষ্ঠিরও সত্যের প্রেষ্টিজ বজায় রাখিবার জন্য কল্যাণের অসত্যকে সত্যের সাজে সাজাইতে গিয়াছিলেন। গান্ধীজী বলবান্ নহেন ভক্ত, তাই সে অপরাধ করেন নাই। আহম্মদাবাদ কংগ্রেসে অনেকেই স্বরাজ ঘোষণার জন্য ব্যগ্র ছিলেন,—কিন্তু ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি নিজেই তাহাতে বাধা দিয়াছিলেন। যাহারা চরকা প্রভৃতি গোটাকতক সহজ কর্ত্তব্যেই বিমুখ হইল, তাহারা স্বরাজের উপদ্রব সহ্য করিবে কিরূপে? বাস্তবিক এবারকার আত্মসংযমে তিনি লাঞ্ছমানভয়ের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় মহাপ্রাণের নিকট প্রাণ অতি তুচ্ছ বস্তু, বাক্যই বড়, তিনি সেই বাক্যকেই ভারতকল্যাণের দ্বারে উৎসর্গ করিয়াছেন। এ আত্মাহুতির মহিমা স্মরণ করিলে সত্যবিশ্বাসীর হৃদয় আশায় উদ্বেলিত হয়। এ সংবাদে কি কারাগারের শৃঙ্খলভার লঘু করিয়া দেয় নাই? আর সেদিনকার কাজ স্বরাজ ঘোষণা বন্ধ করিয়াই শেষ হয় নাই। কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাসেবক দলে নাম লিখাইয়া আইনভঙ্গেও দেশশুদ্ধ লোককে আহ্বান করিয়াছিল। বার্দ্দুলি এবং আনন্দ পল্লীদ্বয়ে নিরুপদ্রব আইনভঙ্গের কাজ পূর্ণভাবে আরম্ভ হইবারও কথা। সমস্ত ব্যাপারেই ধীরত্ব, সুবিবেচনা ও আত্মত্যাগ। ভগবান্ কি এ আরম্ভকে শুভময় করিবেন না? নেতৃবৃন্দকে সরাইয়া দিয়া তিনি স্বয়ং যেন নিজে ভারতের নেতৃত্বগ্রহণে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার জন্য পাদপীঠ প্রস্তুত করিতে হইবে। ছোট বড়,

গৃহী সন্ন্যাসী, ধর্ম্মাচার্য্য, শিক্ষক, চিকিৎসক, বণিক্, কৃষক, শিল্পী—এমন কি মুচি মেথর কসাইকে পর্য্যন্ত সেই মহা অতিথির জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সর্ব্বস্ব ত্যাগ সকলে পারিবে না, তাহার প্রয়োজনও নাই,—কিন্তু প্রত্যেককেই নিজের কর্ত্তব্যে অবহিত ও পরের দুঃখে দুঃখী হইতে হইবে - দিন কতকের জন্য ও ক্ষুদ্রতা ও লোভ বর্জ্জন করিতে হইবে। এখন কি জাতীয় জীবনতরণীর একমাত্র কর্ণধারকে পরিত্যাগ করিবার সময়? আর কোন শক্তি না থাকুক ভগবানকেও ত একটু জানাইতে পারা যায়?

১ম। কিন্তু অনাখ্যাতমূর্ত্তি কোন আদর্শের অনুধাবন কি বুদ্ধিমানের কার্য্য?

২য়। গান্ধীজী সত্যের সাধক এবং তাঁহার সমস্ত জীবন একথার সাক্ষী। তিনি স্বরাজ সাধনায় যে ছায়ার অনুসরণ করিয়াছিলেন, ইহা অবিশ্বাস্য। শিশুর নিকট মাতৃস্তন্য যেমন সত্য স্বরাজও তাঁহার নিকট তেমনি সত্য ছিল। বিশ্বাস দ্বন্দ্বনিবৃত্তির ফল, তাই ভক্ত যুক্তিতর্ক না তুলিয়াই ভগবানকে ভোগ করিতে থাকেন ও তাঁহার নামপ্রচারে জগৎকে মাতাইয়া তুলেন। কিন্তু যুক্তিতর্ক পণ্ডিতের জীবন, তাঁহারা সোজাপথেও দিগ্দর্শন হস্তে বেড়াইতে পাইলেই সুখী হন, এবং স্বাস্থ্যকে বায়ুপিত্তকফের সামঞ্জস্য রূপে নির্দ্দেশ করিয়া তৃপ্তি বোধ করেন, কিন্তু ইহাতে স্বাস্থ্যরক্ষাকে বিপন্ন করিয়াই তুলে। কাজের লোক জানে যে বড়াক্রান্তি বিচার করিয়া চলিতে গেলে পথ চলাই হয় না, তাই তাহারা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার জন্য কালক্ষয়ও করে না,—গান্ধীজিও করেন নাই,—বাহিরের পীড়াপীড়িতে যাহা করিয়াছেন তাহাতে সকলের মন উঠে নাই। যে বস্তু অখণ্ড মঙ্গল তাহাকে খণ্ডবস্তুর ন্যায় সংজ্ঞার আয়ত্ত করাও যায় না। তা ছাড়া স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার,—মাছের পক্ষে জলের মত আমাদের পক্ষেও স্বরাজ-বোধের প্রভাবমুক্ত থাকা ও তাহার সংজ্ঞানির্দ্দেশ করা অসম্ভব। তাই এসবস্থলে সংজ্ঞার বদলে বর্ণনাই দিতে হয়,—স্বরাজ কখনও ধর্ম্মরাজ্য, কখনও অক্ষুণ্ণ স্বাতন্ত্র্য এবং কখনও বা খিলাফৎ হইয়া পড়ে। সকলগুলিই স্বরাজের সহিত যুক্ত, কোনটাই তাহার পূর্ণ পরিচায়ক নহে। কিন্তু সংজ্ঞা অপেক্ষা অনুভূতি বড়, তাহা নিজের প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র নিজেই প্রস্তুত করিয়া লয়। আমরাও সকলে অতি তীব্র ভাবেই স্বরাজের অভাব অনুভব করিতেছিলাম। এমন সময় ভগবান্ কোথা হইতে এক ধীর নির্ভীক শুদ্ধচেতা সফলকর্ম্মীকে আমাদের মধ্যে প্রেরণ করিলেন—তাঁহার নেতৃত্বে সমগ্রভারত এখন স্বরাজের সাধনায় প্রবৃত্ত। সে সাধনা যখন সজীব ও তাহার পথ যখন প্রস্তুত তখন আর সংজ্ঞা লইয়া মারামারি কেন?

১ম। কিন্তু উপায় ত উদ্দেশ্যের নিয়ামক হওয়া উচিত নহে। স্বরাজবাদীর দল যেন বলিতেছেন বৈধ ও নিরুপদ্রব উপায়ে যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই স্বরাজ।

২য়। যাহা বৃহৎ ও সমগ্র—অংশমাত্র নহে, তাহাকে বল বা কৌশলপূর্ব্বক ছিনাইয়া আনিতে হয়ও না, আর যায়ও না। নিজেকেই তাহার সঙ্গে মিলাইয়া দিতে হয়। এইজন্যই সাধনাও সিদ্ধি, উপায় ও উদ্দেশ্য এক হইয়া যায়, গঙ্গাজলেই গঙ্গা পূজা সারিতে হয়। স্বরাজ্য জীবনের মত,—জীবন যেমন শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত অভিন্ন স্বরাজ্যও সেইরূপ ধর্ম্মের সহিত অভিন্ন। জীবননাশই জোর করিয়া করিতে হয়, জীবন রক্ষা সহজ উপায়েই হইয়া

থাকে, সেইজন্য শ্রমাদিও স্বভাবদত্ত সংস্কার। এসবস্থলে পন্থানির্ণয়ে কোন শিক্ষানবিশীর প্রয়োজন নাই,—সত্যের যাহা সহজ ও সরল পথ তাহাই অনুসরণীয় এবং তাহা নিজেও সত্য ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং উপায় ও উদ্দেশ্য অভিন্ন।

১ম। কিন্তু সত্য সাধনার এত সহজ পথ উন্মুক্ত থাকিতে অহিংসা ও অসহযোগের উপর নির্ভর কেন? অহিংসা দুর্বলতার কারণ মাত্র, অসহযোগ মূঢ়তা।

২য়। শক্তিমানের সাহায্য সুগম পথ বটে, কিন্তু শেষঃ রক্ষা না হইতে পারে। বলহীন স্বরাজ্য লাভের অধিকারী নহে। কেহ কি বল ভিক্ষা করিয়া বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে পারে? ষ্টীমারের বলে চলৎশক্তি লাভ করা গাধাবোটের পক্ষে সৌভাগ্য নহে—দুর্বিপাক, তাহাতে তাহাকে অন্ধ ও প্রতারিত করে, নিজের স্বত্ব ভুলাইয়া দিয়া চন্দ্রসূর্য্যের সহিত জ্ঞাতিত্বকামী কুষ্মাণ্ডের অবস্থায় আনিয়া ফেলে। পরের কাঁধে চড়িয়া বামনের প্রাংশুত্বলাভ ঘটে না,—বিশেষ কাঁধ হইতে ফেলিয়া দিবার অধিকারও যদি সেই পরের হাতেই থাকে। আজ পার্লেমেণ্ট দয়া করিয়া অক্ষম ভারতকে যাহা দিবেন কাল আবার তাহা কাড়িয়া লইতেই বা তাঁহাদের কতক্ষণ? আমরা যোগ্যতার পরিচয় দিলে তাঁহারা কাড়িবেন না,—কিন্তু যোগ্যতার বিচার ত তাঁহারাই করিবেন? তাঁহাদের সহিত আমাদের বিচার প্রণালীর মিল হয় কি? তাঁহারা যে ভারতগত প্রাণ তাহাও মনে করিবার কোন কারণ হইয়াছে কি? সুতরাং শক্তির উৎসটী নিজেদের ভিতরই থাকা চাই। অথচ আমরা যে নিতান্তই দুর্ব্বল ও পরাশ্রয়ী হইয়া পড়িয়াছি, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু শক্তি মনের, দেহের নহে,—সুতরাং শুদ্ধতাসাপেক্ষ ও সকল অবস্থাতেই অর্জ্জনীয়। It is never too late. অসহযোগিতা এই শুদ্ধির সাধন পথ। ইহার প্রসাদে মনের দৃঢ়তা লাভ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে শক্তি আসিয়া জুটিবে। শুদ্ধি সেই যীশু কথিত mustard seed—কামান বন্দুকে তাহার বংশলোপ হয় না। আর হইলেই বা কি? পবিত্রতার বিনিময়ে প্রাণরক্ষা করা অপেক্ষা মৃত্যুই কি শ্রেয়স্কর নহে? এই শুদ্ধিলাভের একমাত্র উপায় অহিংসা। নিরীহকে হিংসা করা যায়, কিন্তু অহিংসককে হিংসা করা যায় না। যীশু খৃষ্টের ক্রুশোপাখ্যান বহু পণ্ডিতের মতে অমূলক, ডেসডিমোনার হত্যা অস্বাভাবিক বলিয়াই ঘাতককে কবি স্বজাতীয় বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন নাই। যে ব্যক্তি আহত হইয়াও বলে "ভাই! আমি তোমার শত্রু নহি, না জানিয়াই তুমি আমায় আঘাত করিয়াছ, ভগবান্ তোমার ভ্রান্তি দূর করুন,—" এরূপ লোককে হত্যা করা কি সহজ কথা? যুদ্ধ ত উভয় পক্ষের বল পরীক্ষা? বাতাসের সঙ্গে কি যুদ্ধ চলে? এক হাতে কি তালি বাজে? আর কামান থাকিলেই কি তাহার ব্যবহার করা যায়? যে ব্যবহার করিবে সেও ত মানুষ? তবে কিছুক্ষণ তাহার ভ্রম হইতে পারে, অহিংসাকে সে প্রথম প্রথম একটা ভীরুত্বের ছদ্মবেশ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু বহুদিন এভাবে চলে না, সত্য চাপা থাকে না। রাজনীতি ভক্ত পশুবলদৃপ্ত ইংরাজ আজ আমাদের অহিংসাবাদে বিশ্বাস করিতেছেন না, করিলে নিশ্চয়ই শান্ত হইতেন। তাঁহাকে বিশ্বাস করাইবার প্রয়োজন নাই, চেষ্টাও হয় ত

বিফল হইবে,—কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে অহিংসার অনুশীলন করিলে তাঁহারা আপনারাই বুঝিবেন। সূর্য্য উঠিলে আর তাঁহাকে প্রদীপ জ্বালিয়া দেখাইয়া দিতে হয় না। কেবল জিনিষটা খাঁটি হওয়া চাই,—নহিলে চোখে মুখেও হিংসার প্রকাশ থাকিবে। তাই অহিংসামন্ত্রের যিনি ঋষি, তিনি বলিতেছেন—"কায়মনোবাক্যে হিংসাশূন্য হও, জয় অনিবার্য্য।" পদাঘাত সহ্য করিয়াও চুপ করিয়া থাকা মানুষের কাজ না হইতে পারে, কিন্তু উত্তরে পদাঘাত করাও মানুষের কাজ নহে। বিবাদ পশুচিত, তাহাতে জয় পরাজয়ের মীমাংসা হইতে পারে, আন্তরিক বিরোধের অবসান হয় না,—পরাজিত আবার সময় পাইলেই আক্রমণ করে। অক্রোধের দ্বারাই ক্রোধের প্রকৃত শান্তি হয়। তাই গান্ধীমহাশয় বলেন "অহিংসা ভীরুর ছদ্মবেশ নহে, দুর্ব্বলেরও বল নহে, ইহা পৌরুষাভিমানী মানবের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র।" বলিতে পারা চাই—মনের মিল হউক বা না হউক কেহই আমার শত্রু নহেন, আমি সকলের সেবক।

১ম। কিন্তু জনসাধারণ 'সকলের' সেবা না করিয়া কেবল গান্ধী মহাশয়েরই পূজা করিতেছে এবং আপনাপন ব্যক্তিত্ব হারাইয়া স্বাধীনতা লাভের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে।

২য়। ক্ষেত্রভেদে কোথাও জ্ঞান হইতে ভক্তির কোথাও বা ভক্তি হইতে জ্ঞানের উন্মেষ হয়। প্রকৃত ভক্তি কোথাও 'অন্ধ' থাকে না। সুতরাং ভক্তিকে আমার ভয় নাই, বিশেষতঃ ভক্তিবাদী বাংলাদেশে। গান্ধীজীর যাহারা প্রকৃত ভক্ত তাহারা তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে, সুতরাং 'সকলকে' ভালবাসিবে। নকল ভক্তিকেই ভয় করিতে হয়। আজ কাল ত্যাগের অগ্নি পরীক্ষায় সকলের চিত্তবৃত্তি যেরূপ শুদ্ধতা লাভ করিতেছে তাহাতে সাধারণের ভিতরও প্রচুর ভাবে জন প্রীতির সঞ্চার হইতেছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাহারা কর্ত্তব্যানুরোধে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে শিখে তাহারা স্বাধীনতা লাভের অযোগ্য হয় না।

১ম। কিন্তু 'স্বাধীন' ভারতে কি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এখন অপেক্ষা ক্ষুণ্ণ হইবে না? কোন্ কালে আমরা সে অধিকার এত অধিক পরিমাণে ভোগ করিয়াছি?

২য়। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। মুসলমান সম্বন্ধে যাহা জানি তাহাও ইংরেজেরই লেখা। ভারতে যে রাজ-ভক্তিবাদ প্রচুর পরিমাণে ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রাজগণ প্রায়ই সংস্কারবশে Self-less (আত্ম-পরায়ণতা-শূন্য) হইয়া থাকেন, তখনও হইতেন; পার্শ্বে মন্ত্রিসভার এবং উপরে ব্রাহ্মণশ্রেণীরও যথেষ্ট প্রভাব তাঁহাদের উপর ছিল, রাজধানীর বাহিরে পল্লীবাসীগণ আত্মমনোনীত গ্রাম্যমাণ্ডলিকের দ্বারা শাসিত হইত—সিবিলিয়ান Rhys Davids সাহেবের পুস্তকেও তাহার উল্লেখ আছে। সুতরাং পীড়ন অধিক ছিল, মনে করিবার কোন কারণই নাই। পীড়ন অধিক থাকিলে—এত বিভিন্ন ধর্ম্মমতের এবং নিম্নস্তরে এত স্বাস্থ্য সভ্যতা ও আনন্দের সৃষ্টি হইত না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিমাপ সম্বন্ধে এই কয়েকটী কথা স্মরণীয়:—

(১) কথা বলিবার স্বাধীনতা ও কাজ করিবার স্বাধীনতা এক নহে।

(২) কাগজে কলমে স্বাধীনতা ও প্রকৃত স্বাধীনতা এক নহে।

(৩) পদে পদে গোলাগুলি ও গুপ্তচরের ভয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার হন্তারক।

(৪) মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন ও বিচার বৈষম্য লোকমতস্ফূর্ত্তির ব্যাঘাতক।

(৫) শাসনশক্তি কেন্দ্রীভূত হইলে ব্যক্তিত্বকে কিছু না কিছু খর্ব্ব না করিয়াই পারে না।

(৬) অত্যন্ত অন্নকষ্টের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্যক্ উন্মেষ হয় না।

এই সকল কথা স্মরণ করিয়া মনে হয় ইংরেজের রাজত্বে শাসন অপেক্ষা সাহচর্য্যেই আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার হিসাবে অধিকতর লাভবান হইয়াছি। ইংরাজ নিজে খুব স্বাধীনতা প্রিয়, কথায় কথায় ধর্ম্মঘট করে, উপবাসের ভয় করে না।

১ম। কিন্তু আমাদের মত হরতাল করে না, তাহা ধর্ম্মঘট অপেক্ষাও ভয়ানক। শান্তির সময় পয়সা দিলে জিনিষ মিলিবে না, ইহা চিন্তা করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

২য়। হরতাল স্থায়ী হইলে বিপদ বটে,—কিন্তু ইহা একদিনের ব্যাপার। ধর্ম্মঘটের উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি ইহার উদ্দেশ্য অভিমান প্রকাশ। গরীব যথেষ্ট সহিয়াছে,—একদিন তাহাকে রাগ করিতে দাও। বহুদিন সে তোমাদের দাসত্ব করিয়াছে,—একদিন তাহার সেই বোঝা তোমরা নিজে বহন করিয়া দেখ, তাহার সেবার মূল্য ও দুঃখের পরিমাণ কত। রোমেও প্লীবিয়ান্ দল এইরূপ করিত, কিন্তু স্বাধীন দেশে তাহাদের মর্য্যাদা ছিল,—পেট্রিশিয়ান্ দল তাহাদিগকে অনুনয় করিতে লজ্জাবোধ করিত না। কিন্তু এখানে একদিকে ধনীর হৃদয়হীন কলকারখানা, অপরদিকে সমাজ নিরপেক্ষ দেশবাসীর ততোধিক হৃদয়হীন উপেক্ষা, উভয় দিকেই চিরানুগত ভৃত্যবর্গের নষ্টতায় রোষ। কিন্তু হরতাল ক্ষণেকের বিদ্রোহ, ভয় নাই, শীঘ্রই ক্ষুধার তাড়নে শান্তি ফিরিয়া আসিবে। ব্যক্তিত্ব লোপের ভয় থাকে ত সাবধান সেই বিরামহীন কেন্দ্রীভূত রাজশক্তিকে যাহা "বাত্যার মত প্রচণ্ড, ও নিয়তির মত দুর্ব্বার।" তাহার সহিত অসহযোগই ব্যক্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায়।

১ম। তবে কি অসহযোগিতার কোন কালেই অবসান হইবে না?

২য়। ইহা policy নহে, creed—ব্যক্তিগত শুদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে হইলে পশুবলদৃপ্ত প্রচণ্ড শক্তির সহিত সংস্পর্শ রাখিলে চলিবে না,—তা স্বাধীন অবস্থাতেই কি, আর পরাধীন অবস্থাতেই কি। ক্ষুদ্র ও বৃহতের সম্মিলনে আঘাত ক্ষুদ্রকেই সহিতে হয়, লাভ বৃহতের ভাগেই পড়ে—ইহাই মানবজাতির সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা। অতএব বৃহৎকে একটু দূরে রাখা ক্ষুদ্রের পক্ষে কর্ত্তব্য; অন্যথা বন্ধুত্ব আনুগত্য শেষে স্তাবকত্বে ও পরিণত হইবে। পশুবল যেখানে প্রধান বল, সেখানে আনুগত্য করিতে হইলে পশুত্ব চর্চ্চাই করিতে হইবে,—আত্মশুদ্ধি আসিবে না। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার প্রধান অন্তরায় অন্নবস্ত্রে পরমুখাপেক্ষিতা, তাই এই দুই বিষয়ে যতদূর সম্ভব স্বাধীন হওয়া আবশ্যক। এইখানেই চরকার মাহাত্ম্য,—কলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার শক্তি তাহার আছে কি না এ বিচারদ্বারা তাহার মূল্য পরিমাপ হয় না। কেবল দেখিতে হয় চরকায় বস্ত্র স্বাতন্ত্র্য দিতে পারে কি না। ঠিক্ একই কারণে অন্ন সম্বন্ধেও স্বাধীন হইবার চেষ্টা করা উচিত। অনেকে বলিবেন ইহাতে প্রত্যেক পরিবারকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া অসভ্যতার যুগ পুনরানয়ন করিবে। মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের জন্য আমাদের অধিক সময় যায় না,—বাকী সময়ে আমরা নিজ নিজ শক্তিমত কেহ বা

বিদ্যা দান, কেহ বা স্বাস্থ্য ও দেশ রক্ষার উপায় বিধান, কেহ ধন বৃদ্ধি, কেহ বা সাধারণ ভাবে সমাজ সেবা করিয়া সভ্যতার চর্চ্চা করিতে পারি। অন্য জাতির সঙ্গেও সম্বন্ধ স্থাপনে আপত্তি নাই,—ঐ দুটিমাত্র বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া নিজ সমাজের সহিত সমস্ত বিষয়ে ও অন্যজাতির সহিত বিশেষ বিশেষ বিষয়ে আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিলে সভ্যতার সমস্তই বজায় থাকে। নিজত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বারা দৃঢ়, সমাজ সম্পর্কদ্বারা উন্নত ও আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ দ্বারা উদার হইলে তবে সত্য, শিব, ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা হয়। গোড়ার কথা সত্য - তাহা দৃঢ়তা ও বলবত্তা ব্যতীত অর্জ্জিত হয় না। যাহার নিজত্বই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহার আত্মপ্রসারণ বৃথা, তাহা শিরঃপীড়ার মত অসম্ভব।

শ্রীঅরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ।

- - - -

তিনটি কথা।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

গুরুদেব এবারে মৃত্যু মুখ হইতে টানিয়া রাখিলেন, কতদিনের জন্য ও তাঁর কি কাজে তিনিই জানেন; তাঁর ইচ্ছা পরিপূর্ণ হউক। এই এক মাসে রোগশয্যায় শুইয়া বারম্বার তিনটী কথা মনের উপর আসিয়া চাপিয়াছে।

১। আমরা যাকে সত্য বলিয়া মনে করি তাহা আমাদের পক্ষে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু আমাদের এই সত্যই শেষ কথা নহে। শেষ কথা—ভগবানের প্রকট ঐতিহাসিক বিধান—ব্যক্তির এবং জাতির জীবনে বাহিরের ঘটনাবলী। ভগবানের এই বিধান আমাদের ক্ষুদ্র সত্যাসত্য কল্পনা জল্পনা ও বাদবিতণ্ডাকে অগ্রাহ্য করিয়া আপনার অনাদি-নির্দ্দিষ্ট পথে আপনাকে পরিপূর্ণ করে। ইহাই শেষ কথা,—এর উপরে আর কোনও কথা নাই।

২। বিশ্বটা একটা বিরাট যন্ত্রস্বরূপ, ভগবান যন্ত্রীরূপে এই যন্ত্রের কেন্দ্রে বসিয়া আছেন, ও এই যন্ত্রের অগণ্যকোটী যন্ত্রগুলিকে নিজ নিজ পথে চালাইয়া বিশ্বকে তাঁহার ঈপ্সিত পথে লইয়া যাইতেছেন। * এ যদি সত্য হয়,—আমার চাকা বাঁদিকে ঘোরে, আর একজনের চাকা আমার পাশেই ডানদিকে ঘোরে, আমি এ আব্দার করিব কেন, তার চাকাও আমার মত বাঁ দিকেই ঘুরুক, তাহা হইলে তো যন্ত্র চলিবে না। আমার চাকা আমার দিকে ঘুরুক, অপরের চাকা তাঁদের নিজের নিজের দিকে ঘুরুক; এ লইয়া বাগবিতণ্ডা করা মূর্খতা।

৩। আমাদের দেশের সাধুসন্তেরা , সকল সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াই মতামত লইয়া কাহারও সঙ্গে কখনও বিতর্ক বা বিরোধ করেন না। তাঁদের জীবনে উপনিষদের নিম্নোক্ত মহাবাক্য প্রত্যক্ষ হয়—

> "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
> কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
> তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
> নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥"

যখন দ্রষ্টা অর্থাৎ জ্ঞানী স্বর্ণবর্ণ অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় কর্ত্তা এবং অপর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি স্থান পরমপুরুষ ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তখন তিনি পাপপুণ্য অর্থাৎ বন্ধনভূত সকাম উভয়বিধ কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্মল হইয়া পরম সমতা লাভ করেন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

ক্রমবিকাশ।

প্রার্থনার কান্না হইতে আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে সহকারিতা বর্জ্জন, অতঃপর নির্ব্বিরোধ বাধা প্রদান, দেখিতে দেখিতে এতগুলি পরিবর্ত্তন বৃদ্ধের প্রাণে কেমন করিয়া সহ্য হয়। কিন্তু এ সকল পরিবর্ত্তন যে হবেই হবে, নতুবা একটা দেশ একটা জাতি যে অধঃপাতে যাবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহামান্য সার সুরেন্দ্রনাথের সহিত আমার কথা হইল, রাউলাট আইন পাশের সময়, আমি বলিলাম যুদ্ধে ভারত নিজের রক্ত দিয়া, অর্থ দিয়া প্রাণপণে ইংরাজের সাহায্য করিল, কোথায় কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইয়া ইংরাজ ভারতের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবে, না চরম বন্ধুদ্রোহিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন, এ কি রীতি? তিনি বলিলেন, ব্যাটারা বোকা। তাহার পরে ওডায়ার ও ডায়ারের, অস্ত্রহীন সভাস্থলে মিলিত হংসবাজ কর্ত্তৃক আহত ও আশ্বাসিত দেড় সহস্রাধিক লোকের প্রতি গুলি, নিহত নিগারগণের শাস্তিতে আনন্দ প্রকাশ, এবং সেই ডায়ারের স্মৃতি ও সাহায্য! এ সকলে যদি একটুও শোণিত উত্তেজিত না করে, তবে মৃত্যু অনিবার্য্য। অথচ আমাদের শোণিত উষ্ণ হইলে আমরা কি করিব? জর্ম্মণীর দর্পচূর্ণ করিবার অহংকারে যে ইংরাজ জলে স্থলে শূন্যে বজ্র প্রহার করিতেছে, আমাদের কি আছে, যে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইব। আমরা অস্ত্র থাকিলে অস্ত্র ধরিতাম, কিন্তু তাহা নাই বলিয়াই আমরা সহযোগিতাবর্জ্জন নীতি লইলাম।

ছাত্রগণের প্রতি বেদান্তের ঋষি বলিতেছেন, জগৎ মিথ্যা, সুতরাং চক্ষু মুদিয়া পড়াশুনা কর। কিন্তু জগৎ মিথ্যা হইলে তো পড়াশুনাও মিথ্যা, তজ্জন্য এত মমতা কেন? যে শিক্ষার তিনি এত পক্ষপাতী, সে শিক্ষায় কি দাসত্বপ্রীতি প্রশ্রয় পায় নাই, তিনি বলিতে পারেন। বেদব্যাসের মত সুলেখক হইলেও শিক্ষা বিভাগের লোক ভিন্ন অপরের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু তোমরা কি শিক্ষা দিতেছ? এক স্কুলে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইংরাজরাজত্বে তোমরা সুখী না দুঃখী, তাহারা বলিল, ইংরাজ রাজত্বে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছে, ধনাগম প্রচুর হইতেছে। হায়! নিত্য দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে এই প্রকাণ্ড মিথ্যা যাহারা শিক্ষা দেয়, অথচ যাহারা বলে বাঙ্গালীরা মনুমেন্টের মত মিথ্যাবাদী, আমরা কি বলিব না, হে ইউনিভারসিটী, তোমার নিকটে আমরা এই পর্ব্বতোপম মিথ্যা শিখিতেছি; তোমাদের ইতিহাস, ভূগোল দাসত্বের সোপান, তোমাদের দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, মিথ্যার অবতার।

সহকারিতা করিয়া আমরা কি হইয়াছি? আমাদের বস্ত্রশিল্পসহ শিল্পীর অস্থিতীর পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে, আমাদের জাহাজনির্ম্মাণসহ নির্ম্মাতাকুলের অন্তর্দ্ধান হইয়াছে, "প্রদীপটী

"অলিতে যেতে শুতে যেতে কিছুতে নয় লোক স্বাধীন।" এক মহাযজ্ঞে সহযোগিতা করিয়া অন্নহীন, বস্ত্রহীন জীর্ণকন্থাধারী হইয়া দাঁড়াইয়াছি, ইংরেজ বলিতেছে, ঐ কন্থাখানি আমাকে দিয়া নক্ষত্র ছায়া প্রতিফলিত নীল সলিলে ডুবিয়া যাও।

এই দাসত্ব শিক্ষা আপনাদের ভাল লাগে, কিন্তু যুবকগণের ভাল লাগিবে কেন? এই ডায়ারী প্রেম অনুমোদন করিতে আইন সভায় দেশনায়ক মালব্য মহাশয়কে কতই না উপহাস কতই নির্য্যাতন করিবার জন্য কাউন্সিলের গৌরাঙ্গ কিবা ভেকধারী, কেহই ত্রুটী করেন নাই। আয়ু না কমিলে ত আর মৃত্যু হয় না, কাজেই সহকারিতা বর্জ্জন কি কম দুঃখে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সঙ্গে ভাট, চিক্কণ শোভমান বস্ত্র ছাড়, হ্যাট কোট এসেন্স পোমেটম সাহেবীআনা নবাবী ছাড়িয়া মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় পর, মা'র বাগানের কলারপাতে ডাল ঘি ভাত খাও, জুতা ছেড়ে খড়ম পায়ে দাও। চেয়ার টেবিল ছেড়ে তক্তাপোষ ধর। অট্টালিকা সৌধ ছেড়ে কুটীরের আশ্রয় লও। বৎসর ৫০০০৲ টাকা ব্যয় ছাড়িয়া দিয়া বৎসরে ৬০০৲ টাকায় সংসার চালাও। আর অশন বসনের নবাবীর জন্য ইংরেজের কাছে যাইতে হইবে না। ঋষিদের দেশে আবার ঋষিগণের আচার গ্রহণ কর। দেখ তোমরা স্বাধীন হও কিনা। নিজে নিজে কি রেল, তার, ডাকঘর করিতে পার না? ৩০ কোটী লোক কি মরিয়া গিয়াছে?

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

খুকী।

কোথা হ'তে এলি খুকী?
মুখখানি তোর কনক বরণ
তুই যে মেয়ে সোনামুখী!
তোর হাওয়া লাগ্‌লে গায়
ঊষার বাতাস বয়ে যায়,
শুষ্ক প্রাণে শান্তি আনে
পেলে তোরে কতই সুখী!

২

কোথা হ'তে এলি খুকী?
এত পুণ্য পবিত্রতা
বিশ্বমাঝে নাই যে কোথা,
(তোরে) দেখলে পরে প্রাণটা ভরে
যদিও আমি হই যে দুঃখী।

৩

কোথা হ'তে এলি খুকী?
বুলবুলি, টিয়া, ময়না
তোর মত কথা কয় না,
(তোর) আধ ভাষা জাগায় আশা
তোর তুলনা আর দিব কি?
কোথা হ'তে এলি খুকী!

৪

কোথা হ'তে এলি খুকী?
তোর মুখের এমনি ধারা
তুই যেন গো বিশ্বছাড়া,
এত শোভা এ সৌন্দর্য্য
বিশ্বমাঝে নাহি দেখি।
পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য ফলে
গৌরী রূপে ধরাতলে,
পেয়েছি মা! তোরে আমি
তুই যে মেয়ে সোনামুখী!
কোথা হ'তে এলি খুকী?

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

সন্ধান।

গৃহ বন মরুভূমি পৃথিবী খুঁজিয়া,
না পাই সন্ধান যা'র, ক্লান্ত প্রাণ নিয়া
বসেছি বিরাম লাগি অনন্তের পথে,
হৃদয়-দুয়ার খুলি অঙ্গুলি সঙ্কেতে,
কে যেন বিশ্বের পথে দিল দেখাইয়া,
তুমি বিশ্বে, তুমি সর্ব্ব হৃদয় ভরিয়া।

শ্রীবরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

সঙ্গণিকা।

কোন প্রবন্ধের বা মতের নিরপেক্ষ সমালোচনা পত্রস্থ করাই নব্যভারতের চিরন্তন ধারা। কাহাকেও ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ বা মত লইয়া উপহাসাদি করা ইহার আদর্শবিরুদ্ধ। ইহার পুরাতন লেখকগণ প্রায় সকলেই স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠাতার বন্ধু। তাঁহারা নব্যভারতকে বিশেষ ভাবে স্মরণ ও অনুগ্রহ করিয়া যে সকল রচনা পাঠাইয়া থাকেন তাহা তাঁহাদের স্নেহের নিদর্শন। এই স্থানে তাঁহাদের সমস্ত রচনাই সাদরে পত্রস্থ করা হইয়াছে। নব্যভারতের কোন লেখায় ইহার কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর প্রতি অবিচার ও তাঁহার কষ্টের কারণ হইয়াছে। আমরা তজ্জন্য আন্তরিক দুঃখিত। আশা করি তিনি আমাদিগকে তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

* * * *

শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী প্রতিভাদেবীর অকস্মাৎ পরলোক গমনের সংবাদে আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছি ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের এই শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি নব্যভারতের বিশেষ হিতৈষী ও সাহায্যকারী বন্ধু। ৺প্রতিভাদেবী ৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। তিনি বিদুষী মহিলা ছিলেন, নানারূপ কলাবিদ্যায় তাঁহার অনুরাগ ছিল। বিশেষতঃ সঙ্গীতবিদ্যায় তিনি অতি অনুরাগিণী ও বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি সঙ্গীতসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়া, এতদ্দেশীয় বালক বালিকাদিগকে ভারতীয় সঙ্গীত ও বাদ্যাদি শিখাইতে বিশেষ ভাবে যত্ন ও চেষ্টা করিতেছিলেন। এই কাজে তিনি নিজে পরিবারবর্গের সকলকে নিয়া উৎসাহের সহিত শরীর মন ও অর্থ দিয়া লাগিয়াছিলেন। হারমোনিয়াম ও অর্গান এদেশীয়

বাদ্যযন্ত্র নহে, তারের যন্ত্র ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ; সেই জন্য সঙ্গীতসঙ্ঘে হারমোনিয়াম বা অর্গান সহযোগে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন নাই। তাহাতে তাঁহাকে অনেক সময় ও সঙ্গীত সঙ্ঘের শিক্ষক ওস্তাদদিগকে অনেক বেশী বেতন দিয়া দূরদেশ হইতে আনিতে হইয়াছে। দেশ-প্রীতি ও দেশীয় সঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি এইরূপ বেশী ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি আনন্দসঙ্গীতপত্রিকা নামে একটী সঙ্গীত বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অতি অমায়িক ছিল। সকলের সঙ্গেই সস্নেহ মধুর ব্যবহার করিতেন। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গদেশ একজন বহুগুণ সম্পন্না শিক্ষিতা মহিলা হারাইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইল।

* * * *

ডাক্তার গৌর ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে অসবর্ণ বিবাহবিলের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি দুইটী ভোটের জন্য হারিয়া গিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত পাটেল অসবর্ণ বিবাহের বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু ফলোদয় হয় নাই। দেশে নূতন হাওয়া বহিতেছে, এই নবজাগরণের দিনে শিক্ষিতগণ ও কি এইরূপ বর্ণবৈষম্য উঠিয়া যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝিবেন না ?

* * * *

শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ চৌধুরী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী প্রমুখ বিশজনের স্বাক্ষরিত একখানি নিবেদন পত্র আমরা পাইয়াছি। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মেয়েদের উপযোগী হইতেছে না বলিয়া সকলের মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে। কি প্রকার শিক্ষায় তাঁহাদিগকে সুমাতা সুগৃহিণী ও সুকন্যা করিয়া তোলা যায়—ইহা বিশেষ চিন্তার বিষয়। ইঁহারা সকলকে এ বিষয়ে ভাবিতে ও মতামত প্রবন্ধাকারে বা যাঁহার যে উপায়ে সম্ভব জানাইতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। আশা করি সকলেই এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিবেন ও কেহ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে তাহা দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন।

* * * *

মন্ত্রীগণের বেতন লইয়া দেশের মধ্যে একটা বেশ উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল। আমাদের দেশের প্রতিনিধিগণ ব্যবস্থাপক সভায় কিছুই করিতে পারিলেন না। সাধারণতঃ ব্যবস্থাপক সভায় যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের মতেই অধিকাংশ প্রতিনিধি মত দিয়াছেন ও মন্ত্রীদের ৫৩৩৩৲ টাকাই রহিয়া গেল। তাঁহারা তো দেশের জন্য স্বইচ্ছায় বেতন ছাড়িয়া কিম্বা কমাইয়া দিতেও পারিতেন। শাসন ব্যয় সঙ্কুলনার্থ অর্থের অভাব, নূতন নূতন ট্যাক্স বসাইয়া তাহা পূরণের চেষ্টা হইতেছে। এই দরিদ্র দেশে অন্ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য অর্থের কত প্রয়োজন মন্ত্রিগণ কি একবার ও ইহা ভাবিয়া দেখিলেন না ? শুনিতে পাই, কম মাহিনা হইলে তাঁহাদের প্রেষ্টিজ বা সম্মান নষ্ট হয়। ত্যাগে সম্মান কমে না বরং বাড়ে।

অদ্বৈত-বাদ।*

যে অদ্বৈতবাদ আমরা উপনিষদে দেখি, যে অদ্বৈতবাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাখ্যা বেদান্ত-দর্শনে প্রদত্ত হইয়াছে, এই অদ্বৈতবাদ ভারতের একটা অমূল্য সম্পত্তি। কেবল ভারতেরই বা বলি কেন? মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির যে প্রকার উন্নতি ও কর্ষণ হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে চরম ধারণা করিতে পারা যায়, এই অদ্বৈতবাদ মানববুদ্ধির তাদৃশ কর্ষণেরই ফল। কিন্তু অদ্বৈতবাদকে কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির কর্ষণ, পুষ্টি ও চরমোন্নতিজনিত আবিষ্কার বলিলে, যথেষ্ট বলা হইল না। শঙ্করাচার্য্য যাহাকে 'অনুভব' শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অদ্বৈতবাদ, মানবাত্মার সেই অনুভব-শক্তির আবিষ্কারও বটে। বুদ্ধিবৃত্তির কর্ষণ এবং অনুভবের ফল—এই দুইটী মিলিত হইয়া ভারতে অদ্বৈতবাদ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ব্রহ্ম-চিন্তা-নিমগ্ন ঋষিদিগের মার্জ্জিত চিত্তে এই অদ্বৈত-তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ইহা তাঁহাদিগের অন্তরনুভূতি (Intuition) হইতে লব্ধ। ব্রহ্মবিষয়িনী চিন্তা ও অন্তরনুভূতি—এই দুইএর মিলনের ফলে আমরা এই মহীয়ান্ অদ্বৈত তত্ত্বটীকে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে এই অদ্বৈতবাদ ইউরোপের চিন্তাশীল মনীষীবর্গের মধ্যেও শনৈঃ-শনৈঃ প্রবিষ্ট হইতেছে। এমন দিন অনতিদূরবর্ত্তী, যেদিন ইহারই মূলসূত্র গুলি সমগ্র পৃথিবীর একটা মহতী সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবে। আমাদের এইরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আপনারা জানেন, শঙ্করাচার্য্য এই অদ্বৈতবাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে ও উপনিষদ্গুলির ভাষ্যে নানা ভাবে, নানা প্রকারে করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদ শঙ্করের নিজের আবিষ্কার নহে। যদি আবিষ্কারের গৌরব কাহাকেও দিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, সে গৌরব ঋগ্বেদেরই প্রাপ্য, অপর কাহারও নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে এ কথা বড় নূতন বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। বর্ত্তমানে ঋগ্বেদের পঠন পাঠন এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। কেহই আর এখন বেদগ্রন্থগুলি যত্ন করিয়া অধ্যয়ন করে না। তাই আমাদের এই সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হইতে পারে। ভিত্তিহীন বিবেচিত হইবার আরও একটী কারণ বর্ত্তমানে উপস্থিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের মুখ হইতে আমরা ঋগ্বেদ সম্বন্ধে অন্য প্রকার কথা বর্ত্তমানে শুনিতে পাইতেছি। তাঁহারা ঋগ্বেদের আলোচনা করিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন যে, ঋগ্বেদে কেবলমাত্র কতকগুলি প্রাকৃতিক জড়ীয় পদার্থের প্রতি প্রযুক্ত স্তুতি-গীতি নিবদ্ধ আছে। অর্দ্ধসভ্য, আদিমযুগের আদিম মানববর্গ, ভারতে প্রবেশ করিয়া যখন এ দেশের সূর্য্য, উষা, বজ্র, বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনে, চিত্তে ভীত ও বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ঐ সকল ভয় বিস্ময়-বিমূঢ় সরল মানববর্গের মুখে ঐ সকল প্রাকৃতিক বস্তুর উদ্দেশে যে স্তুতি-গাথা উত্থিত হইয়াছিল, ঋগ্বেদে তাহাই লিপিবদ্ধ আছে। ঋগ্বেদ—কতকগুলি জড়ীয় বস্তুর স্তুতি

* ৬ঠা ফেব্রুয়ারী, "রামমোহন লাইব্রেরী"তে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

প্রকাশক গ্রন্থমাত্র। বর্ত্তমানে আমরা এই প্রকার কথাই শুনিতে আরম্ভ করিয়াছি। অবশ্য, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের প্রতি আমাদিগের কৃতজ্ঞ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন অবস্থা ভারতে একদিন উপস্থিত হইয়াছিল, যখন সমগ্র সায়ন-ভাষ্যসহ, সমগ্র ঋগ্বেদ গ্রন্থ ভারতে একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল! পাশ্চাত্য পণ্ডিত Max Muller, আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, ইউরোপের জার্ম্মাণি, রুষিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সমগ্র ঋগ্বেদ সংগ্রহ করিতে তিনি পারেন নাই। ভারতবর্ষেও কোথাও ভাষ্য-সহ সমগ্র ঋগ্বেদ তিনি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। এই মহাপ্রাণ Max Muller-এর অনন্য সাধারণ ও প্রাণান্ত যত্নের ফলে, আমরা বর্ত্তমানে ঋগ্বেদ গ্রন্থ, সমগ্র ভাষ্যসহ, পাইয়াছি। সে যত্ন ও পরিশ্রমের কথা তিনি আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। এই ঋগ্বেদ প্রাপ্তির জন্য ভারতের হিন্দুসমাজ, তাঁহার নিকটে চির-কৃতজ্ঞ থাকিবে। কিন্তু একটা ভয়ের কারণও বর্ত্তমানে উপস্থিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা জন্মিতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা, আমাদের ঋগ্বেদাদি ধর্ম্মগ্রন্থ গুলির যে প্রকার ব্যাখ্যা দিতেছেন, সে ব্যাখ্যা আমাদের দেশের পুরুষানুক্রমগত ব্যাখ্যা নহে। সে ব্যাখ্যা, আমাদের প্রাচীন ভাষ্যকারাদি-কৃত ব্যাখ্যার নিতান্ত বিরোধী। ঋগ্বেদ যদি, কতকগুলি জড়বস্তুর প্রতি স্তুতি-প্রকাশক গ্রন্থই হয়, তাহা হইলে ঐ গ্রন্থের মূল্য একেবারেই তুচ্ছ হইয়া উঠে। অথচ, আমাদের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম, আজিও, এই ঋগ্বেদের মন্ত্র গুলির দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত,—চূড়া, অন্নপ্রাসন, বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি তাবৎ ধর্ম্ম কার্য্য হিন্দুরা, ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্বারাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। জড় বস্তুর বিবরণ প্রকাশক গ্রন্থের প্রতি এ প্রকার আদর কেন? যাহাতে ঋগ্বেদের একটী মাত্র অক্ষরও কেহ তুলিয়া লইতে না পারে; নূতন সংযোগ করিতে না পারে; স্থান চ্যুত করিতে না পারে; তজ্জন্য কেনই বা ঋগ্বেদে ভয়ানক সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল? আপনারা পদ পাঠ, জটা পাঠ প্রভৃতির কথা শুনিয়াছেন। এগুলি সেই সতর্কতারই ফল মাত্র। জড়ীয় বস্তুর স্তব প্রকাশক গ্রন্থের উপরে ঋষিরা এমন যত্ন ও সতর্কতা লইয়াছিলেন কেন? তাই বলিতেছিলাম, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে, আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই নিষ্ফল হইয়া উঠিবার আশঙ্কা উপস্থিত হইবে, এবং হইতেছেও তাহাই।

আমাদের বিশ্বাস এই যে, ঋগ্বেদের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত একটা প্রকাণ্ড 'অদ্বৈত-বাদ' উপদিষ্ট রহিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই অদ্বৈতবাদের মৌলিক তত্ত্বগুলি তিনি, এই ঋগ্বেদের মধ্যেই পাইয়াছিলেন, এই ঋগ্বেদ হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেদান্ত দর্শনে তাহারই পুষ্টি ও প্রাঞ্জলতা সম্পাদন করিয়াছেন মাত্র। নূতন কিছু আবিষ্কার করেন নাই। কিন্তু আমরা কোন্ প্রমাণের বলে এমন কথা বলিতেছি, তাহা বলিবার অগ্রে, 'অদ্বৈতবাদের' প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

অদ্বৈতবাদ্ সম্বন্ধে কোন কিছু বলিতে গেলেই, আমাদের দৃষ্টি দুইটী বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। বেদান্তে প্রথমেই 'ব্যবহারিক দৃষ্টি' এবং 'পারমার্থিক দৃষ্টি'—এই দুই প্রকার দৃষ্টির কথা

আমরা দেখিতে পাই। সাধারণ অজ্ঞ লোক এই জগৎকে 'ব্যবহারিক দৃষ্টিতে' দেখিয়া থাকে। কিন্তু 'পারমার্থিক দৃষ্টি' সম্পন্ন ব্যক্তিরা এ জগৎকে অন্যরূপে অনুভব করেন। আমরা কথাটা সংক্ষেপে, বেদান্ত-কথিত একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে পরিস্ফুট করিতেছি।

কারণের সঙ্গে কার্য্যের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের উপরেই এই দুই প্রকার দৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন:—

মৃত্তিকা হইতে ক্রমে ক্রমে মৃচ্চূর্ণ, মৃৎ-পিণ্ড, এবং ঘট উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এস্থলে মৃত্তিকাই—উহা হইতে উৎপন্ন মৃচ্চূর্ণ, মৃৎপিণ্ড এবং ঘট প্রভৃতি কার্য্যের 'কারণ'। এখন, এই মৃত্তিকারূপ 'কারণ' হইতে, যে মৃচ্চূর্ণাদি 'কার্য্যবর্গ' ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইল, এস্থলে এই কারণের সঙ্গে, উহার ঐ পর-পর-উৎপন্ন কার্য্যগুলির কি প্রকার সম্বন্ধ?

দুই প্রকারে এই সম্বন্ধটি ব্যাখ্যাত হইতে পারে। অজ্ঞ সাধারণ লোক মনে করে যে, মৃত্তিকাই ত ক্রমে মৃচ্চূর্ণাদিরূপে পরিণত বা বিকৃত হইয়াছে। অতএব এই মৃচ্চূর্ণাদি কার্য্য-বর্গ প্রত্যেকেই এক একটী স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু। মৃত্তিকাই, সম্পূর্ণরূপে মৃচ্চূর্ণাকারে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। আবার মৃচ্চূর্ণ, সম্পূর্ণরূপে আপনাকে মৃৎ-পিণ্ডরূপে পরিণত করিয়াছে। সুতরাং মৃচ্চূর্ণ, মৃৎপিণ্ড প্রভৃতি প্রত্যেকেই এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তু। ইহারা ক্রমাগত বিকৃত হয়। একটী বিনষ্ট হইয়া অপরটী উৎপন্ন হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বস্তুটী, পর পর বস্তুগুলির 'কারণ', এবং পর পর বস্তুগুলি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বস্তুগুলির 'কার্য্য'। 'ব্যবহারিক দৃষ্টিতে' জগতের বস্তুগুলি এই প্রকারেই প্রতীত হইয়া থাকে।

কিন্তু 'পারমার্থিক দৃষ্টিতে' এরূপে বস্তুগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তুরূপে প্রতীত হয় না। পরমার্থদর্শীগণ বুঝিতে পারেন যে, এস্থলে মৃত্তিকার যেটি প্রকৃত স্বরূপ, উহাই প্রকৃতপক্ষে 'কারণ'। এবং এই কারণ-বস্তুটীই প্রকৃত বস্তু। মৃচ্চূর্ণ, মৃৎপিণ্ড, ঘট প্রভৃতি,—সেই কারণ বস্তুটীরই অবস্থা-বিশেষ রূপান্তর মাত্র। এক মৃত্তিকাই, মৃচ্চূর্ণাদি বিবিধ অবস্থান্তর ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এবং এই সকল অবস্থান্তর ধারণ করাতেও, মৃত্তিকার যেটি প্রকৃতস্বরূপ, সেই স্বরূপটির কোনই হানি হয় নাই। উহা যে মৃত্তিকা সেই মৃত্তিকাই রহিয়াছে। বিশেষ বিশেষ আকার ধারণ করিলেও, কারণ-বস্তুটি আপনাকে হারাইয়া ফেলে না। বিবিধ অবস্থান্তরের মধ্যেও, উহার স্বরূপটি একই থাকে। উহা অপর কোন বস্তু হইয়া উঠে না। পরমার্থদৃষ্টিতে এই প্রকার অনুভবই হইয়া থাকে।

আপনারা দেখিতেছেন যে, পরমার্থদৃষ্টিতে জগতের কোন বস্তুকেই, কোন বিকারকেই উড়াইয়া দিবার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইতেছে না। মৃচ্চূর্ণ, ঘটাদি বিকারগুলি, অসত্য মিথ্যা বস্তু হইয়া উঠিতেছে না।

শঙ্করাচার্য্য এই দুই প্রকার বিবরণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, এই উভয় প্রকার দৃষ্টির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই। তিনি এইজন্যই বেদান্ত-ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, "পরিণামবাদকে রাখিয়াই, বিবর্ত্তবাদের প্রাধান্য স্থাপন করা যাইতে পারে।" জগতের কোন বস্তুকেই, কোন বিকারকেই উড়াইয়া দিবার কোন আবশ্যক নাই।

কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের অনেকের ধারণা অন্যপ্রকার। ঋগ্বেদ সম্বন্ধে যেমন

তাঁহারা আমাদিগকে অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা শুনাইতেছেন; শঙ্করের অদ্বৈতবাদেও তাঁহারা বলিতেছেন যে, শঙ্কর এই বিশ্বের নাম রূপাদি বিকারগুলিকে অলীক, অসত্য, মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু শঙ্কর এই জগৎটাকে এভাবে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। তাঁহার ভাষ্যে জগতের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তিনি যে অর্থে বিকারবর্গকে মিথ্যা বলিতে চান সেটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক।

তিনি বলিয়াছেন যে,—

"জগতের এই যে অসংখ্য নাম রূপাদি বিকার পরিদৃষ্ট হইতেছে, ইহাদিগের অপলাপ করা আদৌ সম্ভব নহে। বৃক্ষলতা, পশু-পক্ষ্যাদি বাহ্যবস্তুগুলিকে, কিংবা মন-বুদ্ধি, সুখ-দুঃখ দেহাদি আন্তর বস্তুগুলিকে কাহারই অপলাপ করিবার, উড়াইয়া দিবার অধিকার নাই। যাহা প্রকৃতই বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার কি অপলাপ সম্ভব।"[১]

এই সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়া শঙ্করাচার্য্য, বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যের একস্থলে একটী প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন যে—

"যদি নাম-রূপাদি বিকারগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে বল, তাহা হইলে অদ্বৈত-বাদ টিকে কৈ? ব্রহ্ম ত এক ও অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম ভিন্ন ত অপর কোন বস্তুই নাই। ইহাই ত বেদান্তের সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে নাম রূপাদি বিকার-গুলির অস্তিত্ব স্বীকার করা ত চলে না। উহাদিগকে উড়াইয়া দিতেই ত হয়।" শঙ্কর এই আপত্তির উত্তরে বলিয়াছেন যে,—

"না, নাম রূপাদি বিকারগুলিকে উড়াইয়া দিবার কোন আবশ্যক করে না। উহারা থাকিলেও ব্রহ্মের অদ্বৈতত্বের কোনই ব্যাঘাত হয় না। আমরা জল ও জল হইতে উৎপন্ন তরঙ্গ, ফেন, বুদ্বুদাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা এই আপাততঃ বিরোধের মীমাংসা দেখাইয়াছি মৃত্তিকা ও মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন মৃচ্চূর্ণ, ঘটাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছি যে, নাম রূপাদির অস্তিত্ব থাকিলেও ব্রহ্মের অদ্বৈততার কোন হানি হয় না।"[২]

শঙ্কর জল ও ফেন-তরঙ্গাদি দৃষ্টান্তে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মৃত্তিকা ও মৃত্তিকা হইতে অভিব্যক্ত মৃচ্চূর্ণ, মৃৎপিণ্ড, ঘটাদির যে প্রকার সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই কার্য্য কারণের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যাহা দেখাইয়াছেন তাহার মর্ম্মার্থ এই যে,—

(ক) কার্য্যকে উহার কারণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া যায় না। যে বস্তু যাহা হইতে ব্যক্ত হয়—উৎপন্ন—হয়; সেই বস্তু হইতে তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া, বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া যায় না। ঘটকে কি তুমি যখন উহার কারণ যে মৃত্তিকা, সেই মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে পার? তরঙ্গকে কি জল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া, উহাকেই একটা স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু বলিয়া ভাবিতে পারা যায়?

---

[১] বেদান্ত-ভাষ্য ২।১।১৪
[২] বৃহদারণ্যক-ভাষ্য ৫।৫।১

(খ) কার্য্যগুলি প্রকৃতপক্ষে কারণেরই আকার বিশেষ মাত্র, অবস্থান্তর মাত্র, রূপান্তর মাত্র। কারণ বস্তুটিই—এই অবস্থান্তর ধারণ করিয়াছে। সুতরাং, কারণবস্তুটি উহার প্রত্যেক অবস্থান্তরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়া, উহাদিগকে আপনাতে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং কারণবস্তু হইতে তাহার অবস্থান্তরগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবে কিরূপে? কার্য্যগুলি, উহাদের কারণের বুকেই প্রোথিত থাকে।

কারণবস্তুটি প্রত্যেক অবস্থান্তরের মধ্যেই বর্ত্তমান থাকিয়া যায়; উহা কোন অবস্থা ভেদের মধ্যেই আপনাকে হারায় না। হস্তান্দোলন, ভ্রমণ, বাক্য-কথন—এগুলি আমারই অবস্থা-ভেদমাত্র। তুমি কি ইহার কোনটিকে আমা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে পার? স্বতন্ত্র করিতে গেলেই ইহাদের কোনই মূল্য থাকিবে না। ধূলিমুষ্টিবৎ বিকীর্ণ হইয়া যাইবে। কারণই কার্য্যবর্গকে বাঁধিয়া রাখে। কারণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে গেলেই, কার্য্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং কার্য্যবর্গ, এক একটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তু, ইহা হইতেই পারে না।

(গ) একটা বিশেষ আকার ধারণ করিল বলিয়াও যে, কারণবস্তুটি নিজে একটা কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠিল, তাহা হইতে পারে না। কেন না, প্রত্যেক আকার ভেদের মধ্যে, অবস্থান্তরের মধ্যে সেই কারণ-বস্তুটকে চিনিতে বিলম্ব হয় না। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান্তর ধারণ করাতেও, উহা পূর্ব্বেও যে কারণবস্তু, এখনও সেই কারণবস্তু। একটি গরু যখন শুইয়া আছে, সেই শয়নাবস্থায় উহাকে গরু বলিবে; আর, ঐ গরুটি যখন চলিতে আরম্ভ করিবে সেই চলনাবস্থায় কি উহা গরু না হইয়া, অশ্ব হইয়া উঠে? যে কোন অবস্থান্তরই ধারণ করুক্ না কেন, কারণবস্তুটি আপন স্বরূপে ঠিক্-ই থাকে। অবস্থাভেদের যোগে, নিজে একটা স্বতন্ত্র বা অপর কোন বস্তু হইয়া উঠে না। শঙ্কর এই জন্যই—কার্য্যকারণের সম্বন্ধকে অনন্য শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন অর্থাৎ কার্য্যাকার ধারণ করিলেও কারণ বস্তুটী "অন্য" কোন বস্তু হইয়া উঠে না। সাধারণ অজ্ঞলোক মনে করে বটে, কারণবস্তুর সমগ্রটাই কার্য্যাকারে পরিণত হয়, সুতরাং উহা একটা স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে। কিন্তু পরমার্থদর্শীরা এ প্রকার ভুল করেন না। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, আপনাকে না হারাইয়াই কারণবস্তুটী, বিবিধ রূপান্তর ধারণ করিতে সমর্থ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পরিণাম বাদকে রাখিয়াই বিবর্ত্তবাদের প্রাধান্য উদ্‌ঘোষিত করা যায়। নাম-রূপাদি বিবিধ বিকার অভিব্যক্ত হইলেও, অন্তরালবর্ত্তী কারণবস্তু বা ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপতঃ কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের একত্ব প্রমাণ করিতে, জগৎকে উড়াইয়া দিবার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় না। এত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সত্ত্বেও, লোকে মনে করে যে, জগৎকে অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিয়াই শঙ্করাচার্য্য, তাঁহার ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিয়াছেন!!

এই যে আমরা কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ বর্ণনা করিলাম, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ইহারই উপরে প্রতিষ্ঠিত। এস্থলে, এই তত্ত্বটী আর বিস্তৃত করিয়া দেখাইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না অদ্বৈতবাদের সকল তত্ত্ব বলিতে গেলে, এবং প্রমাণ প্রয়োগের উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্তগুলি

দেখাইতে গেলে, একটীমাত্র বক্তৃতাদ্বারা তাহা কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। যদি আপনারা ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, অদ্বৈতবাদের মৌলিক সিদ্ধান্তগুলির বিস্তৃত বিবরণ ধারাবাহিক বক্তৃতাদ্বারা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বক্তৃতায় আমরা, কেবলমাত্র অদ্বৈতবাদের মূল কোথায়, তাহাই দেখাইতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। সুতরাং কেবল তৎসম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

অদ্বৈতবাদ কার্য্য-কারণের কিপ্রকার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা আমরা এতক্ষণ সংক্ষেপে দেখাইলাম। তদ্দারা আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, জগতের কার্য্যবর্গের অন্তরালে, একটী কারণবস্তু অবস্থান করিতেছেন। সেই কারণবস্তুটী, আপনার স্বরূপকে কার্য্যবর্গের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ বিকাশিত করিতেছেন। কোন কার্য্যকেই, 'স্বতন্ত্র' বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইলেই ভুল হইল। ইহারা কেহই, অন্তরালবর্ত্তী কারণ-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। এক কারণবস্তু বা ব্রহ্মবস্তুই,—নানা আকারে আপনার স্বরূপকে বিকাশিত করিতেছেন। এই আকার বা অবস্থান্তর গুলির দ্বারা তাঁহার স্বরূপের কোন হানি হইতেছে না। তিনি এই অবস্থান্তর যোগে কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠিতেছেন না। সুতরাং অভিব্যক্ত কোন কার্য্যকেই তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া যায় না; কেন না তিনিই ঐ গুলিকে ধরিয়া রাখিয়াছেন এবং উঁহাদের মধ্য দিয়া আপন স্বরূপের বিকাশ করিতেছেন। বেদান্তে শঙ্করাচার্য্য, কারণও কার্য্যের এই প্রকার সম্বন্ধই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আমরা ঋগ্বেদ আলোচনা দ্বারা এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছি যে, শঙ্করের এই কার্য্য-কারণের তত্ত্বটী, তিনি ঋগ্বেদ হইতেই অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। এ তত্ত্ব ঋগ্বেদের মধ্যে অতীব সুস্পষ্ট। ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ কোন জড়ীয় প্রাকৃতিক পদার্থই কেবল নহে। এক চেতন কারণ-সত্তা, এক মহান্ ব্রহ্মবস্তু—সূর্য্য, অগ্নি, মরুৎ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারূপে আপনাকে বিকাশিত করিতেছেন। সূর্য্য চন্দ্রাদি কেহই, ব্রহ্মবস্তু হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। সূর্য্য, ইন্দ্রাদিকে, উঁহাদের অন্তরালবর্ত্তী কারণসত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া, স্বতন্ত্র স্বাধীন পদার্থরূপে ভাবিতে পারা যায় না। অন্তরালবর্ত্তী ব্রহ্মবস্তুও, ইন্দ্র, সূর্য্যাদি আকার-বিশেষ ধারণ করিয়াও, কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু হইয়া উঠেন নাই। তিনি আপন স্বরূপে ঠিক্ রহিয়াই, ইন্দ্রাদি দেবতারূপে আপনাকে বিকাশিত করিয়াছেন। ইহারা কেহই তাঁহার সেই একত্বের হানি করিতে পারে না।

এই মহান্ তত্ত্ব, কার্য্য-কারণের এই মহান্ সম্বন্ধ—ঋগ্বেদে নানা প্রকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা এস্থলে কেবল একটীমাত্র প্রণালীর উল্লেখ করিয়া দেখাইব যে ঋগ্বেদ কেমন কৌশলে অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ঋগ্বেদে অনেক প্রকার যুক্তি প্রদর্শিত আছে। কিন্তু এত অল্প সময়ে ত সকল প্রণালী বলা যায় না। তজ্জন্য আমরা আজ একটীমাত্র প্রণালী দেখাইতেছি।

কার্য্যবর্গের অন্তরালে যে একটী নিত্য, অবিকৃত কারণ সত্তা অবস্থান করিতেছেন, এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য ঋগ্বেদের প্রত্যেক দেবতার আমরা একটী করিয়া 'স্থূলরূপ' এবং সঙ্গে সঙ্গে একটী সূক্ষ্মরূপের উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রত্যেক দেবতার অন্তরালে যে ব্রহ্মসত্তা আ

কারণ সত্তা অবস্থিত, তাহাই ঋগ্বেদ এই সূক্ষ্মরূপের উল্লেখ দ্বারা আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন।

ঋগ্বেদে কেমন সুন্দর করিয়া, এই মহান্ তত্ত্বটী প্রদর্শিত হইয়াছে, এখন আমরা আপনাদিগের নিকটে তাহাই উপস্থিত করিতেছি। আমাদিগের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য ইহা হইতেই পরিস্ফুট হইয়া পড়িবে।

(১)। প্রথমতঃ অগ্নি সম্বন্ধে ঋগ্বেদ বলিয়া দিতেছেন যে, স্থূল অগ্নির মধ্যে অগ্নির একটী সূক্ষ্মরূপ আছে। এই সূক্ষ্মরূপটীই অগ্নির প্রকৃত স্বরূপ। শ্মশানাগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে যে—

"যে অগ্নি এই মৃত দেহটাকে পোড়াইতেছে, আমরা সে অগ্নিকে চাই না। এই অগ্নিকে আমরা দূর করিয়া দিতেছি। এ অগ্নি মৃতের কাঁচা মাংসকে ভক্ষণ করিতেছে এবং এই অগ্নি মৃতদেহের অপবিত্র অংশগুলিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। কিন্তু এই অগ্নিরই মধ্যে অপর একটী অগ্নি রহিয়াছেন। উহাই প্রকৃত অগ্নি। ইহাই এই দৃশ্যমান জড় অগ্নির মধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্ম অগ্নি। এই সূক্ষ্ম অগ্নি কি প্রকার? ইনি "জাতবেদাঃ" এবং ইনি "প্রজানন্"। ইনি সৃষ্ট বস্তু মাত্রকেই জানেন এবং ইনি প্রকৃষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট। ইনিই যজ্ঞে প্রদত্ত হবিকে দেবতাবর্গের নিকট লইয়া যান।" এই বর্ণনা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, স্থূল অগ্নির মধ্যে অবস্থিত কারণ-সত্তা বা চেতন ব্রহ্ম-সত্তারই বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে জ্ঞানের আরোপ করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের অগ্নি যদি কেবল জড় অগ্নিই হয়, তাহা হইলে এরূপ বর্ণনা সম্ভব হইতে পারিত না।

অপর একটী মন্ত্র শুনুন্—

"হে অগ্নি! তোমার দুইটী নাম। একটী স্থূল নাম; অপরটী গুহ্য নাম। তোমার যে অপর একটী নিগূঢ় নাম আছে, আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি। তুমি যে "উৎস" হইতে—যে কারণ সত্তা হইতে উদ্ভূত হইয়াছ, আমরা তাহাও জানিতে পারিয়াছি।" এই 'উৎসকে' 'যোনি' বা উৎপত্তিস্থান বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "তুমি যে 'যোনি' হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছ, আমরা তাহারই উপাসনা করি"।

(২) সোম সম্বন্ধেও দুই প্রকার রূপের উল্লেখ আছে।—

"সোম-লতাকে (হস্তাদি দ্বারা) নিপীড়িত করিয়া যখন তাহার রস বাহির করিয়া পান করা হয়, তখন লোকে মনে করে বটে যে, সোমকে পান করা হইল, কিন্তু যাঁহারা মননশীল তাঁহারা জানেন যে, যেটী প্রকৃত সোম, তাহাকে কেহ পান করিতে পারে না। পৃথিবীর কেহই সেই প্রকৃত সোমকে পান করিতে সমর্থ হয় না"। এস্থলে পাওয়া যাইতেছে যে, সোমের যেটী স্থূলাংশ, তাহাকেই লোকে পেষণ করে ও পান করে; কিন্তু সোমের যাহা সূক্ষ্মরূপ, তাহাকে পান করিবে কে?" এই সূক্ষ্মরূপটী, সোমের মধ্যগত 'কারণ-সত্তা' ছাড়া আর কি হইতে পারে? অন্য স্থানে সোমের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে,—"ধ্রুব সত্য সোমের দুই প্রকার জ্যোতিঃ আছে" এবং "অমৃতের আধার-স্বরূপ সোমের দুইটী অংশ তেজের দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইতেছে।" এ সকল স্থলেও সোমের স্থূলাংশ এবং স্থূলাংশের মধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্মাংশ বা কারণ-সত্তার কথাই পাওয়া যাইতেছে। আবার—

"হে সোম! তোমার একটি নিগূঢ় ও লোক-লোচনের অগোচর স্থান আছে"। "এই সত্য স্থানটীতেই স্তবকারীগণের স্তুতি সকল কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে"। সোম যদি কেবল স্থূল উদ্ভিজ্জই হইবে, তাহা হইলে সেই সোমকে কি প্রকারে বলা যাইবে যে—

"হে সোম! তুমিই পৃথিবীর 'অব্যয় নাভি' স্বরূপ" এবং তোমারই রেতঃ (বীজ) হইতে বিশ্বের তাবৎ প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে"। সোমকে "রেতোধা" নামেও নির্দ্দেশ আছে। সোমের অন্তরালবর্ত্তী 'কারণ-সত্তাই' এতদ্দ্বারা লক্ষিত হইতেছে—

(৩) ইন্দ্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"হে ইন্দ্র দুইটী তোমার শরীর একটি শরীর স্থূল, অপরটি অতিশয় গোপনীয়; অতীব নিগূঢ়। এই গূঢ় শরীরটি বিস্তর স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে এবং এই গূঢ় অথচ ব্যাপক শরীর দ্বারাই ভূমি, ভূত ও ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করিয়াছ এবং জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ উৎপাদন করিয়াছ।" এই নিগূঢ় দেহটি, ইন্দ্রের স্থূলরূপের অন্তরালবর্ত্তী কারণ সত্তা ব্যতীত অপর কি হইতে পারে?

ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই অন্যস্থলে বলা হইয়াছে যে,—"আমরা ইন্দ্রের সেই পরম নিগূঢ় 'পদটিকে' জানিতে পারিয়াছি। ইন্দ্রকে যাঁহারা কেবলমাত্র ভৌতিক জড় পদার্থ বলিয়াই ধরিয়া লন, তাঁহারা এই প্রকার উক্তির সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি দেখাইতে পারিবেন না। যেমন—

"ইন্দ্রই দ্যাবা পৃথিবীকে উৎপন্ন করিয়াছেন; গোস্তনে ক্ষীর দিয়াছেন, সূর্য্যের অভ্যন্তরে জ্যোতিঃ নিহিত করিয়াছেন।"

(৪) সূর্য্য সম্বন্ধেও, স্থূলরূপের অন্তরালে সূক্ষ্মরূপের কথা আছে। প্রথম মণ্ডলের ৫০ সূক্তের এই বর্ণনাটী গ্রহণ করুন—

"সূর্য্যের তিন প্রকার অবস্থা বা রূপ। একটী 'উৎ'; অপরটী 'উৎ+তর', অপরটী 'উৎ+তম'। যে সূর্য্যের জ্যোতিঃ ভূলোকে আইসে, তাহা "উৎ" সূর্য্য। যে সূর্য্য আকাশে ঊর্দ্ধে বিকীর্ণ হয়, তাহা "উত্তর" সূর্য্য। এতদ্ব্যতীত একটী "উত্তম" সূর্য্য আছেন, যাহার উদয়ও নাই, অস্তও নাই।" এই বিখ্যাত বর্ণনাদ্বারা আমরা একই সূর্য্যের কার্য্যাত্মক স্থূলরূপ, কারণাত্মক সূক্ষ্মরূপ এবং কার্য্য-কারণের অতীত অবস্থার কথা পাইতেছি।" বেদান্ত দর্শনের ১।১।২৪ সূত্রের ভাষ্যেও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে,—

"যে সূর্য্য-জ্যোতিঃ আকাশে কিরণ বিকীর্ণ করিয়া থাকে, উহার মধ্যে অনুস্যূত "ব্রহ্ম-সত্তাই" এ স্থলের জ্যোতিঃ শব্দের লক্ষ্য"। আমরা ঋগ্বেদে উল্লিখিত ——:পর উল্লেখ দ্বারা সেই 'কারণ সত্তা'কেই বুঝিতে পারিতেছি।

(৫) বিষ্ণু সম্বন্ধেও অবিকল এই প্রকার বর্ণনা দৃষ্ট হয়।—

বিষ্ণুর তিনটী স্থূল পদ—আকাশ, অন্তরীক্ষ ও ভূলোককে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। কিন্তু বিষ্ণুর যেটী গূঢ় অমৃত-পদ, তাহা কেহই দেখিতে পায় না। সেটী 'মধুপূর্ণ'।" "যাঁহারা বিদ্বান্, যাঁহারা সতত জাগরণ শীল, ঈদৃশ সাধকই কেবল, বিষ্ণুর সেই 'পরম-পদ' কে জানিতে পারেন। অন্যে পারে না।"

বিষ্ণুরও সুতরাং দুই অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। একটী স্থূল কার্য্যাত্মক অবস্থা। আর একটী কারণাত্মক সূক্ষ্ম অবস্থা।

বরুণেরও, বিষ্ণুর ন্যায়, দুইটী 'পদের' কথা আছে। বরুণের একটী পদ অতি নিগূঢ় ও সূক্ষ্ম, তাহাও বলা হইয়াছে। এই নিগূঢ় পদটী, স্থূলরূপের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট সূক্ষ্ম 'কারণ-সত্তা' ব্যতীত অপর কিছুই হইতে পারে না।

আজ আর আমরা অধিক কথা উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। বায়ু, আকাশ সম্বন্ধেও স্পষ্ট করিয়া একটা স্থূল রূপের মধ্যগত অপর এক সূক্ষ্মরূপের কথা আছে। সকল দেবতা সম্বন্ধেই এই প্রকার উক্তি দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঋগ্বেদ যে কেবল এই দুই প্রকার রূপের নির্দ্দেশ করিয়াই কারণসত্তার ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা নহে। ঋগ্বেদে ইহা অপেক্ষাও অন্যপ্রকার প্রণালী দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মসত্তার স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে। কিন্তু আজ মাত্র একটী প্রণালীর নির্দ্দেশ করিয়াই, আপনাদের নিকটে বিদায় লইতেছি।

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

আল-মামুন।

আব্বাস বংশীয় খালিফা হারুণ রসিদের* তিন পুত্র ছিল। [illegible] তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে মামুন তাঁহার মধ্যম পুত্র। মামুন বাল্যকাল হইতেই বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁহার ধীশক্তি ও মেধাশক্তি অতি প্রখর ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই সাহিত্য বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। সে সময়ে বোগদাদ নগর বিদ্যা ও জ্ঞান চর্চ্চার কেন্দ্রস্থান ছিল। পরবর্ত্তী দেশ দেশান্তর হইতে নানাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ আসিয়া খালিফার দরবার অলঙ্কৃত করিতেন এবং খালিফাও তাঁহাদিগের সমুচিত সমাদর ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। রাজকুমার মামুন ঐ সকল বিদ্বান মণ্ডলীর নিকট অধ্যয়ন ও বিবিধ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেন। কালক্রমে মামুন বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শিতা এবং তর্ক শাস্ত্রে বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। রণবিদ্যায়ও তাঁহার সম্যক জ্ঞান ও গভীর নিপুণতা ছিল। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি শত্রুকুল দমন ও রাজ্যে সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপন করিয়া রাজ্যের সমৃদ্ধি সাধন ও প্রজাপুঞ্জের সুখ বর্দ্ধন করিতে যত্নবান হইলেন। তাঁহার অমিত উদ্যমে ও অবিশ্রান্ত যত্নে সুবিশাল ইসলাম সাম্রাজ্যে কৃষি ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইল এবং প্রজাকুল সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত দেশে শান্তি স্থাপন, প্রজাপুঞ্জের সুখ বর্দ্ধন এবং সাম্রাজ্যের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেন। দেশে দেশে সুপ্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ, পথ পার্শ্বে বহুতর পান্থশালা স্থাপন কূপ ও জলাশয় খনন, দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা, পীড়িত ও ব্যাধিগ্রস্থ লোকদিগের জন্য বাসভবন ও দাতব্য ঔষধের ব্যবস্থা করণ, মাতৃ পিতৃহীন শিশুদিগের ভরণপোষণ ও বাসস্থানের অনুষ্ঠান, সর্ব্বশ্রেণীর শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ সদনুষ্ঠান করিয়া, তিনি অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

---

* আরবী বর্ণে লিখিতে ও উচ্চারণ করিতে হইলে হারুন-অর-রসীদ আকারে লিখিত হইয়া থাকে কিন্তু সাধারণতঃ উর্দ্দু ভাষার কথোপকথন কালে হারুণ-রসীদ রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

কিন্তু শিক্ষা বিস্তার, বিদ্যাচর্চ্চা, বিবিধ শাস্ত্রের অবিরাম আলোচনা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব বিকাশ সাধনই মামুনকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। তাঁহার রাজত্বকালে চিকিৎসাবিদ্যা এবং ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রের উন্নতি চরম সীমায় উঠিয়াছিল। মামুন মুক্ত হস্তে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া দেশ দেশান্তর হইতে অসংখ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা অনুবাদ করাইতেন। তাঁহার দরবারে নৈয়ায়িক দার্শনিক ও বিজ্ঞানবিদগণ সদাসর্ব্বদা জ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহাদের পরিতোষের জন্য অপ্রমেয় অর্থ ব্যয় করিতেন। এবং পারিতোষিক দিয়া যে সকল শ্রেণীর লোকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। গ্রীস হইতে প্লেটো, স্পেন হইতে আল কিন্দি, ভারতবর্ষ হইতে নাগ এবং পারস্য, মিসর, প্রভৃতি অন্যান্য দেশ হইতে তৎকালিন প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণ তাঁহার দরবার অলঙ্কৃত করিত।

ঈদৃশ প্রবল প্রতাপান্বিত বৈভব-গৌরবে সমুন্নত এবং শৌর্য্যবীর্য্যে বিভূষিত সম্রাটের অন্তঃকরণ কখন অহঙ্কার বা আত্মাভিমান দ্বারা কলুষিত হয় নাই। তিনি উন্নতমনা উদারচেতা জন হিতৈষী ও সরল প্রকৃতি মনস্বী ছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ দয়াদাক্ষিণ্য ন্যায়পরতা ও সৌজন্যতা পূর্ণ ছিল। মামুন কিরূপ সরল প্রকৃতি ও সদ্‌গুণালঙ্কৃত ছিলেন তাহা তাঁহার লিপিবদ্ধ জীবন বৃত্তান্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

প্রায়ই জ্ঞান বিজ্ঞানবিদ্‌গণ দরবারে নিমন্ত্রিত হইয়া রাত্রিকালে তাঁহার অতিথি হইতেন। মামুন স্বয়ং তাঁহাদের আতিথ্য সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। সন্ধ্যার সময়ে তিনি তাঁহাদের সহিত পরিচিত সুহৃদের ন্যায় আলাপ ও বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। আলাপান্তে মামুনের শয়ন কক্ষে তাঁহাদের শয়নের বন্দোবস্ত হইত।

কাজি এহ্‌ইয়া সে সময়ে একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান মনস্বী ও বোগদাদের প্রধান বিচার-পতি ছিলেন। একদিন তিনি মামুনের আতিথ্য স্বীকার করেন। মামুনের শয়ন কক্ষে তাঁহারও শয্যা অধিষ্ঠিত ছিল। দ্বিপ্রহর রাত্রিকালে হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি পিপাসায় অধীর হইয়াছিলেন। মামুন তাঁহার অধীরতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাজি সাহেব, কিরূপ অবস্থা?" কাজি সাহেব পিপাসার বিষয় জানাইলেন। মামুন স্বয়ং উঠিয়া অপর কক্ষে চলিয়া গেলেন এবং জলপূর্ণ একটী কুঁজা লইয়া আসিলেন। ইহা দেখিয়া কাজি সাহেব বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং কহিলেন, "হুজুর! আপনি কেন কষ্ট করিতেছেন, কোন ভৃত্যকে আদেশ করিলেই জল লইয়া আসিত।" মামুন প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "না, পরসেবায় রত জন জগতে প্রধান।"

এক সময়ে মামুন উদ্যানে বেড়াইতেছিলেন। কাজী এহইয়া ও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মামুন তাঁহার হাত ধরিয়া বেড়াইতেছিলেন। যাইবার সময়ে সূর্য্য কাজী সাহেবের দিকে ছিল। আসিবার সময়ে দিক পরিবর্ত্তন হইল এবং সূর্য্যের কিরণ মামুনের দেহে পতিত হইল। কাজী সাহেব মামুনকে ছায়ায় রাখিবার মানসে দিক পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু মামুন তাহা পছন্দ করিলেন না। তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, "ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে, প্রথমে আমি ছায়ায় ছিলাম এবং আপনি সূর্য্য কিরণে ছিলেন; এক্ষণে ছায়ার দিকে থাকা আপনার অধিকার।"

একদা একটী নিঃসহায়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোক মামুনের দরবারে আসিয়া অভিযোগ করিল যে "এক দুর্বৃত্ত আমার প্রতি উৎপীড়ন করিয়া আমার সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছে।" মামুন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এরূপ কার্য্য করিয়াছে এবং সে কোথায় আছে।" বৃদ্ধা ইঙ্গিতের দ্বারা দেখাইয়া দিল। মামুন বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্বাসকে দেখাইতেছে। আব্বাস তখন পিতার নিকট বসিয়াছিলেন। মামুন তৎক্ষণাৎ প্রধান মন্ত্রিকে আদেশ করিলেন, "শাহজাদাকে অভিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় বৃদ্ধার সম্মুখে দণ্ডায়মান কর।" উভয়ের বিচার আরম্ভ হইল। মামুন দুই জনার এজেহার লইলেন। শাহজাদা আব্বাস আস্তে আস্তে থামিয়া থামিয়া এজেহার দিলেন কিন্তু বৃদ্ধা নির্ভয়ে ও উচ্চ স্বরে অভিযোগ বর্ণনা করিতে লাগিল। উজির তাহাকে ঐরূপ স্বরে কথা কহিতে নিষেধ করিলেন এবং কহিলেন খালিফার সম্মুখে উচ্চ স্বরে কথা বলা ভদ্রতার পরিচায়ক নহে। ইহা শুনিয়া মামুন কহিলেন, "উহাকে নিষেধ করিও না, উহার যেমন ইচ্ছা তদ্রূপ স্বাধীনভাবে কহিতে দাও; সত্যতা উহার মুখ খুলিয়া দিয়াছে এবং আব্বাসকে মূক করিয়া তুলিয়াছে।" অবশেষে মামুন বৃদ্ধার অনুকূলে বিচার নিষ্পত্তি করিলেন এবং আব্বাসকে তাহার সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে আদেশ করিলেন।

এক সময়ে একব্যক্তি স্বয়ং মামুনের উপর ত্রিশ হাজার টাকার দাবীতে অভিযোগ আনয়ন করে, এই কারণে মামুনকে বিচারালয়ে কাজীর নিকট জবাব দিবার জন্য উপস্থিত হইতে হয়।

স্বয়ং খালিফাকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হইবে এ বিষয় প্রকাশ হওয়ায় হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। কর্তৃপক্ষ ও ভৃত্যগণ শশব্যস্ত হইয়া খালিফার উপবেশন যোগ্য সাজসরঞ্জামাদি উপযুক্ত স্থানে যথা বিধি স্থাপন করিয়াছিল। মামুন বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে কাজি সাহেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এখানে আপনি এবং অভিযোগকারী দুই সমান" আপনি বিচারালয়ে খালিফা স্বরূপে আসেন নাই, প্রতিবাদী স্বরূপে আসিয়াছেন, আমি উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখাইতে পারিব না"। ইহা বলিয়া কাজিসাহেব আদেশ করিলেন যে উভয় পক্ষকে সমভাবে যথাস্থানে দণ্ডায়মান করাও। কাজি সাহেবের আদেশানুসারে উভয় ব্যক্তিকে যথা স্থানে দণ্ডায়মান করান হইল। ইহাতে মামুন কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না বরং কাজি সাহেবের ন্যায়পরায়ণতা ও মানসিক দৃঢ়তায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মাসিক বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

মামুনের মৃত্যু।

মামুন যখন মানবলীলা সংবরণ করেন তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৭ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই বিদ্রোহ দমন ও সাম্রাজ্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপনে অতিবাহিত হইয়াছিল। যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে মুক্ত হইয়া যতটুকু অবসর পাইয়াছিলেন, সেই সময়ও সুযোগ তিনি সাম্রাজ্যের উন্নতি, প্রজাপুঞ্জের সুখ বর্দ্ধন, এবং শিক্ষাবিস্তার ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধনে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁহার মহতী ইচ্ছা সমুদয় ও আন্তরিক

বাসনাগুলি কার্য্যে পরিণত হইতে দিল না। অন্তরের শত কামনা প্রস্ফুটিত হইতে না হইতেই শুকাইয়া গেল।

একদিন মামুন স্বীয় ভ্রাতা মোতাসেম সমভিব্যহারে বাজানুজুন্ তটিনী তটে বায়ু সেবনে বহির্গত হইলেন। নদীর জল অতি নির্ম্মল ছিল। সূর্য্য কিরণে উদ্ভাসিত উর্ম্মিমালা নৃত্য করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছিল। মামুন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়া পড়িলেন। মামুন ও মোতাসম তটিনী তীরে মৃত্তিকার উপরে উপবেশন করিয়া পা দুখানি জলে ডুবাইয়া দিলেন। সা'দকারী মামুনের অন্তরঙ্গ সেখানে উপস্থিত ছিল। মামুন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এরূপ সুশীতল ও নির্মল জল কখন দেখিয়াছ কি?" সা'দ অল্প জল পান করিয়া বলিল, "বাস্তবিকই এরূপ জল অনুপমেয়।" .... সকলে কিছু জলযোগ করিয়া নদীর শীতল জল পান করিলেন, কিন্তু যখন ঐ স্থান হইতে উঠিলেন মামুন জরভাব অনুভব করিলেন। জর ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া উঠিল। মামুন জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। .....যখন মৃত্যু সন্নিকট হইল, তিনি তখন অমাত্য বর্গ, সেনাপতি সমূহ, বিদ্বান্ মণ্ডলী ও আত্মীয় স্বজনকে একত্রিত করিয়া মর্ম্মস্পর্শী বাক্যে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করিলেন।

"ঈশ্বরই কেবল প্রশংসার পাত্র যিনি সকলের অদৃষ্ট মৃত্যু লিখিয়াছেন, তিনিই অনন্তকাল বর্ত্তমান থাকিবেন। দেখ, আমি কিরূপ প্রতাপান্বিত সম্রাট ছিলাম, কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করিবার কোনই ক্ষমতা আমার নাই বরং রাজত্ব আমার ভবিষ্যৎ জীবনকে অধিকতর ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। অহো! আমি জন্ম গ্রহণ না করিলে ভাল হইত। হে আবু এসহাক, (তাঁহার ভ্রাতা, যাঁহাকে তাঁহার মৃত্যুর পর খলিফা পদের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন) আমার সম্মুখে এস। আমার অবস্থা দেখিয়া শিক্ষা লাভ কর। ঈশ্বর খেলাফতের মালা তোমার গলায় দিয়াছেন। যে ঈশ্বরের শেষ বিচারকে সর্ব্বদা ভয় করে, ঐ ব্যক্তির ন্যায় তোমার জীবন যাপন করা উচিত। প্রজা পুঞ্জের মঙ্গলের জন্য যে কার্য্য তোমার গোচরীভূত করা হইবে তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে সম্পন্ন করিবে। বলবান হীনবলদিগকে যেন উৎপীড়ন না করে; বয়োবৃদ্ধ দিগের সহিত সর্ব্বদা সমাদর ও প্রীতির সহিত ব্যবহার করিবে; যাঁহারা তোমার সহায় তাঁহাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবে এবং সকলের বৃত্তি ও মাসিয়ানা বজায় রাখিবে।"

অতঃপর তিনি কোরাণ শরিফের কয়েক পদ পড়িতে পড়িতে মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িলেন; ধীরে ধীরে প্রাণ নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তে মিলাইয়া গেল।

মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন।

যীশুর পবিত্রাত্মা লাভ।

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা মুখের কথায় ব্যক্ত করা কঠিন। ভাবুক যে কথাটা ভাবের ভাষায় বলেন, অভাবুক সে কথাটা আপনার স্থূল বুদ্ধিতে কেমন করিয়া বুঝিবে? যীশুর পবিত্রাত্মা লাভ একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার, যর্দ্দনতীরে ঐ রহস্য বুঝিয়াছিলেন তিনি, আর তাঁহার দীক্ষাদাতা যোহন।

সেকালে সে দেশে একদল ভাবুক লোক ছিলেন, তাঁহাদের নাম ছিল "এসেনী" (Essenes), এসেনীদের পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া গেলে সুসমাচারের অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে। কিন্তু সে ইতিহাস প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। যতটা এসেনীদের সম্বন্ধে জানা গিয়াছে, তাহাতে তাঁহারা যে ভারতীয় ভাবুকদের মতনই একটা দল ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারত হিন্দুকুশের দ্বার রুদ্ধ করিয়া হিমালয়ের এপারে চুপ করিয়া ধ্যানমগ্ন বসিয়া ছিলেন, এ কালের ঐতিহাসিক আলোকে একথাটা সাহস করিয়া বলা যায় না। সে দিন একখানা পুস্তকে পড়িতেছিলাম, সলোমনের জাহাজ যে অফির বন্দর হইতে সোনা লইয়া যাইত, তাহা সৌরাষ্ট্র দেশে অবস্থিত ছিল।

শুধু ভারতের সোনার ডেলাই ওদেশে পৌছিত না। আমাদের বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতের অনেক আধ্যাত্মিক তত্ত্বও ঐ সকল সোনার ডেলার সঙ্গে ঐ সকল দেশে রপ্তানি হইত। ওদিকের ভাবুকেরা এদিকে আসিতেন না, বা এদিকের ভাবুকেরা ওদিকে যাইতেন না, তাহা বলা কঠিন। রশ্মিকে কে কাঠা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে পারে? যে প্রাণ ব্রহ্ম-জ্যোতিতে পরিপূর্ণ, সে প্রাণের সে জ্যোতি কোন দেশ বিশেষে আবদ্ধ থাকিতে পারে না।

এসেনীদের সম্বন্ধে যতটা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে তাঁহারা যে আমাদের ধর্ম্মভ্রাতা ছিলেন, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। দীক্ষা দাতা যোহনকে অনেক খ্রীষ্টিয়ান পণ্ডিতও এসেনী দলভুক্ত বলিয়া মনে করেন। খ্রীষ্টের জীবন ও শিক্ষার পাশ্চাত্য পর্দ্দা তুলিয়া ভিতরে ঢুকিলে অনেক কথা আমরা আমাদেরই মতন দেখিতে পাই। ইহার কারণ কি! তবে তিনিও কি এসেনীদের সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখিতেন? পাঠক, এই কথাটা মনে রাখিয়া আমাদের সঙ্গে একবার যর্দ্দনতীরে চলুন।

এ যুগের সমালোচকেরা মার্ক লিখিত সুসমাচারকে প্রথম সুসমাচার বলিয়া মনে করেন। মার্ক যীশুর পবিত্রাত্মা লাভ সম্বন্ধে লিখিতেছেন "যেমন তিনি জল মধ্য হইতে উঠিলেন, তেমনি তিনি দেখিতে পাইলেন, স্বর্গ বিদীর্ণ হইতেছে এবং আত্মা কপোতের ন্যায় তাঁহার উপর (বা তাঁহাতে) নামিয়া আসিতেছেন।"

মার্কের বর্ণনানুসারে এই ঘটনার দ্রষ্টা যীশু। আর কেহ—পবিত্রাত্মাকে তাঁহার উপর অবতীর্ণ হইতে দেখিয়াছিলেন কিনা, মার্ক তাহা খুলিয়া লেখেন নাই। মার্ক স্বর্গ শব্দটাকে বহু বচনে ব্যবহার করিয়াছেন। যীশু "স্বর্গসমূহ" বিদীর্ণ হইতে দেখিলেন। মার্কের এক

পাঠ অনুসারে আত্মা কপোতের ন্যায় তাঁহার "উপর" (গ্রীক্ Ep' auton) অবতীর্ণ হইলেন; কিন্তু আর এক পাঠ অনুসারে (Eis auton = into him) তাঁহার "অভ্যন্তরে" অবতীর্ণ হইলেন।

মার্কের ভিত্তিতে লিখিত মথির সুসমাচারে কথাটা একটু খুলিয়া লেখা হইয়াছে মাত্র, মূল ঘটনার বর্ণনে ভিন্নতা নাই। বহু অনুসন্ধানে লিখিত লুকের সুসমাচারে ঐ সময় যীশুর প্রার্থনা করিবার কথা আছে, স্বর্গ শব্দটা এক বচনে ব্যবহৃত হইয়াছে, আর পবিত্রাত্মার দৈহিক আকারে কপোতের ন্যায়" অবতরণের উল্লেখ আছে।

চতুর্থ সুসমাচার যোহনের নামে পরিচিত। (দীক্ষাদাতা যোহন নহেন, সিবদিয়ের পুত্র যোহন।) কিন্তু এই সুসমাচার খানির আসল লেখক কে ছিলেন, তদ্বিষয়ে সমালোচক মহলে মহা মহা বাদানুবাদ চলিতেছে। তবে সুসমাচার খানা যে অনেক পরবর্ত্তী কালের রচনা তৎ-সম্বন্ধে গোঁড়া ও অগোঁড়া উভয় দলে বিশেষ বৈষম্য নাই—সময় নিরূপণে দুদশ বৎসরের তারতম্য আছে মাত্র। এই নবীন সুসমাচারে যীশুর দীক্ষার বর্ণনা নাই, কেবল যীশুর উপর স্বর্গ হইতে কপোতের ন্যায় পবিত্রাত্মার অবতরণ সম্বন্ধে দীক্ষাদাতা যোহনের সাক্ষ্য আছে—দীক্ষা দাতা যোহন আপনাকে ঐ ব্যাপারের দ্রষ্টা বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

সুসমাচার চতুষ্টয়ের লেখকগণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঘটনাটী জানিতেন না। সম্ভবতঃ দীক্ষাদাতা যোহনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কথাটা প্রাথমিক মণ্ডলীর খ্রীষ্টিয়ানেরা অবগত হন। দীক্ষাদাতা যোহন ভাবুক লোক ছিলেন। ভাবের ভাষায় তিনি বলিয়াছিলেন "আমি আত্মাকে কপোতের ন্যায় স্বর্গ হইতে নামিতে দেখিয়াছি, তিনি তাঁহার উপরে অবস্থিতি করিলেন।"

ভাবুক দীক্ষাদাতা কি অর্থে স্বর্গ, কি অর্থে কপোত, ও কি অর্থে সেই কপোতের অবতরণ বলিয়াছেন, তাহা তাঁহারই ন্যায় ভাবুক না হইলে বোধগম্য করা অসম্ভব। এ কারণ সাধারণ খৃষ্টিয়ানদের বিশ্বাস, যীশু যখন দীক্ষাপ্রাপ্তান্তে জল হইতে উঠিয়া আসিতেছিলেন, তখন আমাদের মাথার উপর যে দৃশ্যমান নীল আকাশ বিস্তারিত রহিয়াছে, তাহাই ফাটিয়া গেল, আর ঐ ছিদ্র দিয়া পবিত্রাত্মা কপোত-দেহ ধারণ পূর্ব্বক স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিলেন, ও যীশুর মাথার উপর উপবেশন করিলেন। যীশু স্বয়ং এই ব্যাপার চর্ম্মচক্ষে দেখিয়াছিলেন দীক্ষাদাতা যোহনও এই ব্যাপার চর্ম্মচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

অতঃপর যে স্বর্গীয় বাণীর উল্লেখ আছে—"ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত"—সে বাণীটাকেও খ্রীষ্টিয়ানেরা দৃশ্যমান আকাশ-বাণী ও এই চর্ম্ম কর্ণে শোনা বাণী মনে করেন—যদিও এখানেও স্বর্গ শব্দটা মূল গ্রীকে বহু বচনেই দেখিতে পাই।

খৃষ্ট ও খৃষ্টিয়ধর্ম্মের এই প্রকার mythological ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে এ যুগে পাশ্চাত্য জগতে অনেকেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছেন। এদিকে এরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা ভারতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারও একটা মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিরক্ষর জেলে, মুচিদের যা ইচ্ছা শিখাইয়া খৃষ্টিয়ানের সংখ্যা বাড়াইতে পার, কিন্তু তাহাতেই ভারত ভরিয়া যাইবে, এমন মনে করিও না। "ভারতবাসীদের হৃদয়ে খ্রীষ্টের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের আর এক প্রকার ব্যাখ্যা চাই। নতুবা বর্ত্তমান শিক্ষার আলোকে

যাঁহারা নিজ ধর্ম্মের উপকথা গুলি পরিত্যাগ করিতেছেন, তাঁহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের উপকথা গুলি কেমন করিয়া গ্রহণ করিবেন ?

বাধ্য হইয়া অবান্তর কথা অনেক বলিলাম, পাঠক ক্ষমা করিবেন। এখন এসব কথা ছাড়িয়া যীশুর পবিত্রাত্মা প্রাপ্তিরূপ আধ্যাত্মিক রহস্যের একটুকু মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করি। এ চেষ্টায় আমাদের ভারতীয় প্রাচীন ঋষি'দর সহায়তা লইতে হইবে—যদি পূজ্যপাদ এসেনীদের কোন ধর্ম্ম শাস্ত্র বিদ্যমান থাকিত, তবে তাহা হইতেও আমরা যথেষ্ট সহায়তা পাইতাম।

প্রথমতঃ জল-দীক্ষা বা জলে দীক্ষা। খ্রীষ্টীয় জগৎ সাধারণতঃ জল দীক্ষার যে সাঙ্কেতিক (symbolic) ব্যাখ্যা করেন, তাহা যীশুর সম্বন্ধে খাটেনা। সাধারণ খ্রীষ্টীয় ব্যাখ্যানুসারে, জলে যেমন শরীর ধৌত হয়, যীশুর রক্তে তেমনি মানুষের পাপ ধৌত হয়—জল-দীক্ষা ঐ পাপ ধৌতের সঙ্কেত বা নিদর্শন। যীশু পাপ রহিত ; তবে তাঁহার জল দীক্ষার অর্থ কি ! এই ব্যাপার লইয়া খ্রীষ্টীয় বিদ্যাবাগীশেরা যথেষ্ট বিদ্যা-চাতুর্য্য দেখাইয়াছেন। সে সকল কথার এ স্থলে উল্লেখের আবশ্যক নাই।

পাপ ও পাপমুক্তি অবশ্য ধর্ম্ম বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। যে আত্মা ঈশ্বরের কৃপায় সজাগ হইয়াছে, সে আত্মা পাপ হইতে মুক্তি চায়। তবু কেবল পাপ মুক্তিই সাধক জীবনের লক্ষ্য নহে। পাপরূপ প্রেত স্কন্ধ হইতে নামিয়া গেলে প্রাণটা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। ইঁহারই নাম খৃষ্টিয়ানের ভাষায় মুক্তি। কিন্তু এ মুক্তি একটা অভাবাত্মক (negative) সাধন—পাপাভাব বা পাপের দণ্ডাভাব মাত্র। মুক্তির একটা ভাবাত্মক সাধন আছে। সে সাধন ব্রহ্মে অবগাহন। "জলে দীক্ষা" এই ব্রহ্মে অবগাহনের নিদর্শন বা symbol.

আত্মার ব্রহ্মাবগাহন দুই প্রকারে ঘটে। বহিঃপ্রকৃতির সংস্পর্শে প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মের অনুভূতি। দ্বিতীয়তঃ "হিরণ্ময়ে পরে কোষে"—অর্থাৎ আত্ম-সম্বিৎ নাম জ্যোতির্ম্ময় শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে পরমাত্মার অনুভূতি। এদেশের সাধকেরা ওতপ্রোত ভাবে ব্রহ্মকে সমগ্র বিশ্বে অনুভব করিতেন, আবার আত্মসম্বিদে ডুবিয়া তাঁহার মহাসম্বিদে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। এ তত্ত্ব ভারত হইতে ও দেশে যায় নাই, বা ও দেশের এসেনী ও ভাবুকেরা এ তত্ত্ব জানিতেন না, তাহা কেমন করিয়া বলিব ?

জল বাহ্য প্রকৃতির একটা জিনিষ মাত্র। সাধক একটা জিনিষের দ্বারাও সর্ব্ব জিনিষের সার তত্ত্বে পৌঁছিতে পারেন। কথাটা সাধন-সাপেক্ষ। বিনা সাধনে কথাটা কেহ বুঝিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না।

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ২।২৭।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি সমুদয় জগতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

"যিনি অগ্নিতে, যিনি জলেতে"—যীশু জলে অবগাহন পূর্ব্বক ঐ জলে ব্যাপ্ত ব্রহ্মে অবগাহন করিলেন। তুমি যখন জলে অবগাহন কর, তখন কি জলব্যাপ্ত ব্রহ্মের স্পর্শ

অনুভব কর? শরীর জল স্পর্শ করিবে, কিন্তু আত্মা ব্রহ্ম স্পর্শ করিবে। এ তত্ত্ব গভীর, কিন্তু এ তত্ত্ব সাধকের অনুভূত— উপলব্ধির বিষয়।

আমি তীর্থস্নানের বিরোধী নহি, যদি তীর্থজলে স্নাতক ব্রহ্মানুভূতি করেন। প্রাচীন ভারত নদীজলে ব্রহ্মস্ফূর্তি দেখিত—"যো অপ্সু"—নদীজলে অবগাহন পূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপে ডুবিত। পৌরাণিক ভারত (সম্ভবতঃ মুসলমান বা তৎপূর্ব্ব যুগের খ্রীষ্টীয় শিক্ষার অনুকরণে) বিশেষ বিশেষ নদীর পাপ প্রক্ষালন শক্তি উদ্ভাবন পূর্ব্বক তীর্থ স্নানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ঋষিরা নদী জলের পাপ প্রক্ষালন শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা প্রকৃতিতে দেবদর্শন করিতেন। পরবর্ত্তীকালে উপনিষদের ঋষিগণ প্রকৃতিতে ব্রহ্ম দর্শন করিয়াছিলেন—"যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু।" নাসরতের যীশুও যর্দ্দনের জলে ব্রহ্মদর্শন পূর্ব্বক ঐ জলে অবগাহন করিলেন—ব্রহ্মে ডুবিয়া গেলেন—ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন। ইহাই যীশুর জলদীক্ষার ভারতীয় ব্যাখ্যা। ইহাতে পাপ ক্ষালনের কথা নাই।

দ্বিতীয়তঃ স্বর্গসমূহের উদ্ঘাটন বা বিদারণ। মাথার উপর ঐ যে নীলিমা দেখা যাইতেছে, তাহাই কি স্বর্গ? স্বল্প বুদ্ধি মানুষ এরূপ বিবেচনা করিতে পারে। যত্র ব্রহ্ম ব্যাপকরূপে অবস্থিত, তত্র জ্ঞানীর স্বর্গ। স্বর্গ বহু, স্বর্গ অসংখ্য, স্বর্গ অনন্ত। স্বর্গে যাইতে হইলে ঐ নীলিমার পরপারে যাইবার আবশ্যক নাই। যে মানুষটা একবার প্রকৃতির একটা জিনিসের সংস্পর্শে আসিয়া ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মস্পর্শন লাভ করিয়াছে, প্রকৃতির প্রতি পদার্থ ঘোমটা খুলিয়া তাহাকে ডাকিতেছে, আয়! আমি তোকে স্বর্গ দেখাইব—আমি তোকে স্বর্গে লইয়া যাইব।

পত্রে, পুষ্পে, ফলে, সরিৎ, সিন্ধু, জলে সর্ব্বত্র স্বর্গ। প্রস্তরে, ভূস্তরে, যাবৎ চরাচরে, সর্ব্বত্র স্বর্গ। অনলে, অনিলে, ঐ পাখীটার গানে, সর্ব্বত্র স্বর্গ। তোমার ঐ সরল শিশুর হাসিতে, মধুময়ী স্ত্রীর মাধুর্য্যে স্বর্গ। যা দেখিবে, তাই স্বর্গ; যা ছুঁইবে, তাই স্বর্গ। ইহারই নাম স্বর্গসমূহের উদ্ঘাটন বা স্বর্গসমূহের বিদারণ। প্রকৃতির প্রতি পদার্থের মধ্য হইতে কে যেন সাধককে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে—সে যেন কার আধ ঢাকা, আধ খোলা মুখ দেখিয়া মোহিত হইয়া রহিয়াছে!

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।
কেনোপনিষৎ ১৩।

ধীর (অর্থাৎ জ্ঞানীগণ) ভূতে ভূতে (অর্থাৎ সমুদায় বস্তুতে) পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া ইহলোক হইতে উপরত হইয়া অমর হয়েন।

ঈশ্বর নরক সৃষ্টি করেন নাই। পুণ্যময় ঈশ্বরের পক্ষে নরক সৃষ্টি করা অসম্ভব। তাঁহার সমুদায় সৃষ্টি স্বর্গ। নরক তোমার আমার সৃষ্ট। যখন আমরা কুনয়নে পবিত্রতম বস্তু দর্শন করি—যখন কুবাসনায় পবিত্রতম বস্তু বুকে চাপিয়া ধরি, তখন স্বয়ং আমরা নিজ আত্মায় নরকের সৃষ্টি করি।

যীশু জলে অবগাহন পূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপে অবগাহন করিলেন। জল হইতে উঠিয়া চক্ষু

মেলিয়া দেখিলেন, সমগ্র বিশ্বই ব্রহ্মস্বরূপে পরিপূর্ণ। সমগ্র বিশ্ব পুণ্যময়ে বিভাসিত হইয়া পুণ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সমগ্র বিশ্ব স্বর্গ। অতএব তাঁহার সম্মুখে স্বর্গসমূহ খুলিয়া গেল —বিশ্ব বিদীর্ণ করিয়া বিশ্বেশ্বর দেখা দিলেন।

তাই তাঁহার প্রচার মন্ত্র ছিল "অনুতাপ কর, স্বর্গসমূহের রাজ্য নিকটে।" যে জিনিসটা তোমাকে স্বর্গসমূহ দেখিতে দিতেছেনা—স্বর্গসমূহে প্রবেশ করিতে দিতেছেনা, সে জিনিসটা পাপ—বাসনার বশে সান্তকে অনন্ত বলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরা। সান্তে অনন্তের দর্শন পাপ নহে। সান্তকে অনন্ত ভাবা পাপ। ঐ পাপ ছাড—বাসনা কাট—সর্ব্বত্র স্বর্গ পাইবে।

তৃতীয়তঃ কপোতরূপে পবিত্রাত্মার অবতরণ। যখন স্বর্গসমূহ খুলিয়া গেল—প্রকৃতি প্রতি পদার্থ পুণ্যময় বুক উদ্ঘাটন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে বিদ্যমান হইল, তখন ঐ প্রতি পদার্থের অন্তরালে আত্মারূপী ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ ঘটিল। এখন ঐ আত্মারূপী ভগবান কি কেবল "ভূতেষু ভূতেষু" থাকিবেন? তাহা নহে। তিনি দ্রষ্টার প্রাণেও আসিবেন। মার্কের পাঠান্তরে *epi* "উপর" শব্দের পরিবর্ত্তে *eis* (into) বা "অভ্যন্তর" শব্দ দেখিতে পাই। আত্মারূপী ভগবান ঐ বহিঃ প্রকৃতির অসংখ্য বস্তুর মধ্য হইতে তাঁহার আত্ম সম্বিদের অভ্যন্তরে অবতীর্ণ হইলেন। অবতীর্ণ হওয়া সাধারণ ভাষা, স্ফূর্ত্তিমান হওয়া ভাবের ভাষা। সাধকের অন্তরাত্মায় অস্ফূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি। যিনি বাহিরে, তিনিই অন্তরে। যিনি স্বর্গসমূহে, তিনিই প্রাণের কন্দরে। এই অভিজ্ঞতার নাম পবিত্রাত্মার অবতরণ। পবিত্রাত্মা আসেনও না, যানও না, চড়েনও না, নাবেনও না। তিনি সর্ব্বব্যাপী ভগবান। তিনি সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিমান। তাঁহার স্ফূর্ত্তি ও অস্ফূর্ত্তি প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের জ্ঞান বা অনুভূতির স্ফূর্ত্তি ও অস্ফূর্ত্তি। আমাদের অন্তশ্চক্ষু যখন অন্ধ তখন ব্রহ্ম অস্ফূর্ত্তিমান বলিয়া বোধ হন। আমাদের অন্তশ্চক্ষু যখন ফুটিয়া যায়, অমনি প্রাণের ভিতর "প্রাণস্য প্রাণম্" স্ফূর্ত্তিমান ব্রহ্মকে দেখিতে পাই। যীশু যর্দ্দনের জলে ও বাহ্য প্রকৃতিতে যাঁহাকে দেখিতেছিলেন, এখন প্রাণের ভিতর আত্ম সম্বিদে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥
মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।৯।

হিরণ্ময় (অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়) (আত্মসম্বিদরূপ) শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে রজ রহিত, কলা রহিত ব্রহ্ম (প্রকাশিত আছেন।) তিনি শুভ্র, জ্যোতিষ্মান্ বস্তু সমূহের জ্যোতি। তিনি সেই, যাঁহাকে আত্মবিদেরা জানেন।

কপোতের ন্যায়। লুক লিখিতেছেন দৈহিক আকারে কপোতের ন্যায়। দৈহিক বলিলে যে দৈহিকই বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। ভাষার অলঙ্কার আছে। অনেক সময় ভাবের গাঢ়তা দেখাইবার জন্য দেহ শব্দের ব্যবহার হয়। সুতরাং এখানেও যদি মহাত্মা লুক "দৈহিক" শব্দটাকে আলঙ্কারিকভাবে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে? অথবা যদি লুক "দৈহিক" শব্দটাকে নিরবচ্ছিন্ন "দৈহিক" বুঝিয়াই প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে কি আসে যায়?

যর্দ্দনের ঐ ঘাটে কেহ ক্যামেরা লইয়া সেই স্বর্গীয় কপোতটার ছবি তুলিয়া রাখেন নাই। মুখের কথা মুখে মুখে উড়িতে উড়িতে অনেক সময় পক্ষপ্রাপ্ত হইয়া পাখীর আকারই ধারণ করে। লুক যীশুর সমসাময়িক নন, পরবর্ত্তী কালের লোক। দীক্ষাদাতা যোহন যে কথাটা ভাবের ভাষায় বলিয়াছিলেন, লুকের কর্ণ পর্য্যন্ত পৌছিতে পৌছিতে সে কথাটায় বাচা যদি দৈহিকতার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে তাহাতেই বা আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কি আছে?

আত্মা নিরাকার, অরূপ। সেই পক্ষ ও অঙ্গপূর্ণ দৈহিক আকার ধারণ অসম্ভব। ইহা অবতারবাদের বিরোধী ব্যাখ্যা। অশরীরী শরীরী হবেন, অজড় জড় হবেন, অরূপ রূপ হবেন, তাহা কি সম্ভব? যদি তাহা সম্ভব হয়, তবে ঈশ্বর ঈশ্বর থাকেন না—ঈশ্বর স্ববিরোধ দোষে দুষ্ট হন।

তবে কপোতরূপী পবিত্রাত্মার অবতরণের অর্থ কি? ইহার অনেক অর্থ থাকিতে পারে। একটা অর্থ, প্রাচ্য দেশে পাখী আত্মার symbol বা নিদর্শন। পার্সীদের ধর্ম্মে এই symbol বা নিদর্শন দেখিতে পাই—বৈদিক ধর্ম্মে এই symbol বা নিদর্শন দেখিতে পাই।

প্রাচীন পার্সিপলিস নগরের ভগ্নাবশেষের চিত্রাবলীর মধ্যে দারা বাদশাহের একটা চিত্র দেখিয়াছি। বাদশাহ সিংহাসনে বসিয়া আছেন, অহুর মজদা (অর্থাৎ ঈশ্বর) পক্ষীরূপে পক্ষপুট বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকোপরি বিরাজ করিতেছেন। ঐ পক্ষী অহুর মজদার নিদর্শন মাত্র। কোন পার্সীই একথা বিশ্বাস করেন না, যে অহুর মজদা কোন কালে পক্ষীরূপে অবতার গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

ঋগ্বেদে নিম্নলিখিত ঋক্‌টী দেখিতে পাই। উহা উপনিষদে ও উদ্ধৃত হইয়াছে।

দ্বা সুপর্ণা স যুজা সখায়া সমানং বৃক্ষে পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্ন্যোঽভিচাকশীতি॥
ঋগ্বেদ ১।১৬৪।২০। মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।১।

দুই পরস্পর সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন পক্ষী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মিষ্টফল ভক্ষণ করেন, আর একজন অনশন থাকিয়া (কেবল) দর্শন করেন।

ঋগ্বেদে এই দুই পক্ষীর যে অর্থই হউক না কেন, উপনিষদে ঐ দুই পক্ষীর একটী জীবাত্মা ও অপরটী পরমাত্মা। জীবাত্মা সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিতেছেন, পরমাত্মা স্বয়ং অনশনে থাকিয়া তাহা দর্শন করিতেছেন।

কপোতরূপী পবিত্রাত্মা ঐ দ্বিতীয় পক্ষী। যেমন পক্ষীরূপী অহুর মজদা দারা বাদশাহের মাথার উপর পক্ষ পুট বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহার সংরক্ষণ করিতেছেন, কপোতরূপী পবিত্রাত্মা সেইরূপে যীশুর মাথার উপর আপনার পক্ষপুট বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহার সংরক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। এটা মার্কের প্রথম পাঠের অনুরূপ ব্যাখ্যা।

আবার উপনিষদের সখারূপী দুই পক্ষী:—পবিত্রাত্মা কপোত, যীশুর পবিত্র আত্মাও কপোত। দুই কপোতে মিতালি—দুই কপোতের অন্তর্যোগ। যে ফলটা "যীশু কপোত" খাবেন, সেটা কি মিষ্ট ফল? বৈদিক ঋষি ফলটাকে মিষ্ট অনুমান করিয়াছিলেন, সন্দেহ

নাই। কিন্তু ও ফলটা যে ক্রুশ ফল। এ গাছে কি মিষ্ট ফল ধরে? পিত্তমিশ্র সিকা ও ফলের রস—পাপ ক্লিষ্ট জগতের তিক্ততা ও ফলের আস্বাদ! কপোতরূপী পবিত্রাত্মা তাঁহার প্রাণের ডালে বসিয়া তাঁহাকে ঐ ফল আস্বাদন করিতে বলিতেছেন। পবিত্রাত্মার পক্ষ-পুটের অন্তরালে আপনাকে লুকাইয়া, পবিত্রাত্মায় মণ্ডিত হইয়া পবিত্র যীশু ঐ ফল আস্বাদন করিতে যর্দ্দনতীর্থ হইতে ক্যালবরী তীর্থে * যাত্রা করিতেছেন।

আমাদের প্রাচ্য বুদ্ধিতে কপোতরূপী পবিত্রাত্মার এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এসেনী ভাবুক যোহন ঋষিও বোধ করি এই অর্থেই কপোতরূপী পবিত্রাত্মার অবতরণ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। এ কপোত চর্ম্মচক্ষে দৃষ্ট দেহধারী কপোত নহেন। এ কপোত অচর্ম্ম চক্ষে দৃষ্ট অদেহী পরমাত্মা। সূক্ষ্ম বুদ্ধির অভাবে মানুষ কথাটা জড় ভাবে গ্রহণ করিয়াছে।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

ধ্রুব।

ওরে সংসারী রে ব্যাকুল ক্রন্দন
চলিলেন ধ্রুব সংসার ছাড়ি
　　সিংহাসনের আশ।
উজল রত্ন মণি মাণিক্য শত বাসনার ধন,
সুরুচির দুটি পেলব বাহুর মদির আলিঙ্গন,
স্বর্গের আশা শান্তির সাধ, তৃপ্তির মোহ টুটি
চির অজ্ঞাত জ্ঞানের সাগরে দিলেন অভয় পাড়ি
সংসারে যাহা রয়, নহে শাশ্বত নহে অমৃত
　　নহে তাহা ধ্রুব নয়।
একটী স্বপ্ন একটী মোহন অবুঝ মরিচীকা
বাসনা মুক্ত মনের মাঝারে লাগায়ে দিয়াছে দিশা
ও নহে দীপ্তি, ও নহে তৃপ্তি নহেক ও ধ্রুব সুধা,
সুরুচির মায়া জালিয়া শুধুই জালায় অনল ক্ষুধা।
　　চলিলেন ধ্রুব বন;
রচিতে অমর অমৃতময় অচল সিংহাসন।
ওপের সৃষ্টি—ত্যাগের রচনা নহে ও হিরণ্ময়
নাহিক মুগ্ধ মনের দৈন্য চিরজ্যোতি অক্ষয়।

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা।

---

* জেরুশালেমের বাহিরে যেখানে খ্রীষ্ট ক্রুশ প্রাপ্ত হন, সেই স্থানটির নাম ক্যালবরী পাহাড়।

শিক্ষা জগতের যৎকিঞ্চিৎ (৪)

যাঁদের মনের বৈচিত্র্য আমাদের একঘেয়ে জীবনকে সুরে তালে মণ্ডিত করে, বিদ্যাদান ব্যাপারটাকে সরস করে তোলে, সেই ছাত্র ছাত্রীদের সম্বন্ধে আমার যে স্বল্প অভিজ্ঞতা আছে এবার তাই কিছু বলা যাক্। এঁদের সকলেরই মনের পাত্র একই ধাতুতে গঠিত নয়, আকারে ওজনেও সমান নয়, তাই ঠিক সমান পরিমাণে একই রকমের জ্ঞান এঁদের সমান ভাবে পরিবেশন করা চলে না, এবং এঁদের কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্য যা, তা আদায় করার ব্যবহার বিধি ও একপ্রকার হ'লে সবসময়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। এ সব কথা আমরা ভুলে যাই – বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে অন্ততঃ খানিকটা ভুলে না গেলে চলেও না—এবং সেই জন্যই সমান দিয়েছি মনে করে সমান ফলের প্রত্যাশা করে যখন নিরাশ হই, তখন সমান ফলটা জোর করে আদায় করতে গিয়ে দেখি, মন্থন দণ্ডের মুখে অমৃতের বদলে গরলও সময় সময়ে উঠে আসে।

জন্মগত এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার বৈচিত্রের ফলে বিচিত্রমনা এই যাঁরা আমাদের হাতে এসে পড়েন, তাঁদের আমরা মনের কতকগুলি মোটামুটি গুণানুসারে বিশেষ পর্য্যায়ভুক্ত করি এবং সেই অনুসারে চালাতে চেষ্টা করি। সরকারী এবং অর্দ্ধসরকারী শিক্ষাপীঠ গুলিকে শিক্ষা বিভাগের বাঁধা গৎ সামলাতে এতই ব্যস্ত থাকতে হয় যে এই পর্য্যায়গুলির দিকেও যথোচিত দৃষ্টি রাখা যায় না।

কোন কোনও শিশু থাকে যে স্বাভাবতঃই কল্পনাপ্রবণ। সে নিজের মনে অনেক রকম কাল্পনিক অবস্থা চিন্তা করে এবং শিশু বলেই কল্পনা এবং বাস্তবের তফাৎটা ধরতে পারে না ও কল্পনাটাকেই সত্য বলে মনে করে নেয়। এ সকল শিশুর সঙ্গে খুব সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। এই কল্পনা প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিলে, বাস্তব এবং কল্পনার প্রভেদ শিশুচিত্তের কাছে পরিস্ফুট না করে দিলে এ সকল শিশু অতি সহজেই অতি-রঞ্জন বাদী হয়ে ওঠে এবং উত্তর কালে লোকের মুখে এই ই শোনা যায় "ওর শতকরা ৯৯টা বাদ দিলে বাকীটুকু সত্য।" আমি একটী শিশুর আত্মীয়ের মুখে শুনেছি যে তাঁরা এই শিশুটির শৈশবে তার কল্পনা প্রবণতার তারিফ করে এখন এর বয়সকালে খুব ভুগছেন। সে সত্যকথা বলতে এখন পারে না। অনেক সময় এদের কল্পনা প্রবণতাকে সংযত করবার জন্য খুব কঠিন উপায় অবলম্বন করা হয়। এতে যে খুব সুফল উৎপন্ন হয় আমার তা মনে হয় না। অন্ততঃ আমি নিজে দেখি নাই।

আমি জানি একটি শিশুকে যে কল্পনা এবং বাস্তবের প্রভেদ বুঝতে না পেরে রাত্রে যা স্বপ্ন দেখেছিল তা সত্য মনে করে সেটাকে প্রচার করে। তার চেয়ে বড় যারা তারা তাকে এই জন্য "মিথ্যাবাদী" ইত্যাদি বলে তার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে। শিশুটী এতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়। কিন্তু তার সৌভাগ্যক্রমে তার এমন একজন বয়স্ক বন্ধু ছিলেন যিনি তাকে বুঝিয়ে

বলেন যে "হাঁ, তোমার কাছে এটা সত্যি কারণ তুমি এটা দেখেছ, কিন্তু ওদের কাছে এটা সত্যি নয় কারণ ওরা এটা দেখেনি আর দেখতেও পাচ্ছে না।" শিশু সবকথা বুঝতে পারে নাই—তলিয়ে বুঝবার তার সামর্থ্য ছিল না কিন্তু মিথ্যাবাদী হওয়ার লজ্জা থেকে সে নিস্তার পেয়েছিল। আর যারা তাকে ঘৃণা করেছিল তারা যে ইচ্ছা করেই তার উপর একটা অন্যায় করেছিল এও নয়, এটা বুঝতে পেরে তাদের প্রতি মনে একটা খারাপ ভাব পোষণ করে নাই।

এই পর্য্যায় ভুক্ত শিশুরা অনেক সময় কোন ও একটা কাল্পনিক অবস্থাতে সুখ পায় বলে সেই অবস্থাটাকে বাস্তব বলে প্রচার করে সে যে ইচ্ছা করেই মিথ্যা বলে তা নয়। এ ক্ষেত্রে তাকে শাস্তি দিলে বা তার প্রতি কোনও মনোযোগ না করলে দুয়েরই ফল বোধ হয়, এক হয়। এই রকম মন প্রায় দুর্ব্বল-স্নায়ু (hysteric এবং nervous) শিশুদের মধ্যেই দেখা যায়। একেবারে অবহেলা করলে বা গুরুদণ্ড বিধান করলে এরা hysteria গ্রস্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আমারই একটী ছোট ছাত্রী একদিন স্কুলে এসে খুব কান্না জুড়ে দিয়েছিল, তার সঙ্গিনীদের কাছে এই বলে, যে তার সৎমা তার প্রতি খুব অত্যাচার করেন এবং সেই দিনে বিশেষ করে তাকে কষ্ট দিয়েছেন, শুধু এই কারণে যে তার স্বর্গগতা মায়ের কাপড় পরে তার মায়ের কথা মনে এনেছিল। সঙ্গিনীর দল ত অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তেই তাকে সমবেদনা জানাচ্ছিল, এমন সময় আমি সেখানে গিয়ে পড়তে সমস্ত জিনিস-টাই মাটি হয়ে গেল। আমি মেয়েটীকে ভাল করেই জানতুম তার মা আমার বন্ধু, আর তার বাবার দুবার বিয়েই হয়নি। তার সঙ্গিনীরা আমায় যখন তার কান্নার কারণটা দিল, আমি তখন রাগব কি হাসব তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে প্রশ্ন করে যা টের পেলাম তা এই, Cinderellaর গল্প পড়ে অবধি তার ভারী ইচ্ছা যে তার একটী সৎমা হন এবং তিনি তাকে এত কষ্ট দেন যেন সারা দুনিয়া তার প্রতি অনুকম্পায় ভরে ওঠে। আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে তার মনের তৃপ্তির জন্য বেচারা বাবা মায়ের ঘাড়ে মিথ্যা করে এতখানি দোষ চাপিয়ে দিলে তাঁরা খুব খুসী হবেন না।

কত সময়ে দেখা যায় যে শিশুর ব্যবহারে কোনও সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না; গুরুজনদের কত সময়ে বলতে শোনা যায় যে ছেলেটার ঘাড়ে ভূত চেপেছে বা ছেলেটাকে মারে পেয়েছে। লাঠ্যৌষধি দানেই যে ঘাড়ের ভূত শায়েস্তা হয়ে যায় তা নয়, বরং এর বিপরীত ফলই অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়। শিশু মনও যে Consistencyর কদর বুঝে। ভূতের আসাটা যতই inconsistent হউক না কেন, সে এসে যে এমন বে-কায়দায় চলে যাবে তা হয় না। এই আমার ঘাড়ে ভূত চেপেছিল, তার জন্য এত কাণ্ড হয়ে গেল আর এখখুনি দুটো বেতের বাড়ীতেই যদি ভূতটা নেমে গেল, তবে ভূত চাপার সার্থকতা রইল কৈ? বেতের বাড়ি বা বকুনি কখনো কখনো ভূতকে আরো শক্ত করেই ঘাড়ে বসিয়ে দেয়। অনেক সময় ভূত চেপেছে দেখেও ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যদি গুরুমশায় সন্দিহান হয়ে পড়েন ত দেখা যায় যে ছাত্রও সন্দেহ করতে আরম্ভ করে, যে তার ঘাড়ে ভূত চেপেছে।

যারা আদুরে গোপাল, অহংজ্ঞান যাদের একটু বেশী তাদের ভূতের অস্তিত্বটা স্বীকার করে একটু তোয়াজ করলেই ভূত শীঘ্র নেমে যায়।

কলম্বোতে থাকতে একদিন সকালবেলা কিণ্ডারগার্টেন ক্লাশে ঢুকেই দেখি হুলস্থূল ব্যাপার। ঘরের মাঝখানে মেঝের উপর একটা ছোট্ট চেয়ার উলটিয়ে পড়ে আছে, ছোট্ট ২ ছাত্র ছাত্রীরা সব বড় ২ চোখ করে ব্যস্ত হয়ে তাদের দৃষ্টি মেলে ধরেছেন শিক্ষয়িত্রী এবং একটী ছোট্ট মহিলার উপর। শিক্ষয়িত্রী নানারকমে চেষ্টা করছেন এই মহিলাটীকে দিয়ে চেয়ারটা তোলাতে, সে কিছুই শুনছে না কেবল পা দাপাচ্ছে আর বলছে "আমি কখখনো চেয়ার তুলব না, ও তো ঝিতে করে।" ঝি ছাড়া, যে মেয়ে চেয়ার ফেলে দেয় সেও যে করে এটা শিক্ষয়িত্রী তাকে কোনও রকমে বুঝিয়ে উঠতে পারছেন না। শিক্ষয়িত্রী আমার হাতে ক্রোধান্বিতাকে সমর্পণ করে দিতে আমি তাকে আমার অফিস রুমে নিয়ে এলাম। বিদ্যালয়ে এর মত ভয়ঙ্কর স্থান আর নাই—এ যে ফৌজদারী আদালত, যত অপরাধীর দণ্ডবিধান তো এখান থেকেই হয়। আমি তাকে একটা কোণ দেখিয়ে বললুম "তুমি তবে ঐ কোণটায় দাঁড়িয়ে চেঁচাও, আমার তো এখন তোমার কথা শুনবার অবসর নাই। তোমার যখন চেঁচান হয়ে যাবে আর তারপর যদি চেয়ার ওঠাবার মজ্জা তোমার হয়, তা হলে আমায় জানিয়ো তখন হয়ত আমার তোমার দিকে মন দেবার অবসর হবে।" প্রায় কুড়ি ত্রিশ মিনিট পরে মেয়েটীর ঘাড়ের ভূত নামলো এবং সে নিজেই আমায় জানালো যে সে চেয়ার তুলবে।

আমার ছাত্রাবস্থায় আমায় অতি সহজেই এ রকম ভূতে পেয়ে যেতো। আমার নিজের বিষয় আমি এটা জানি যে আমায় যতই তাড়না করা হ'ত, ভূত ও ততই শক্ত হয়ে ঘাড়ে চাপতো কিন্তু কিছুক্ষণ তার দিকে বড়রা যদি খেয়াল না করতেন তো সে আপনিই নেমে যেতো। কিন্তু নামবার পর যদি তার আমার সম্বন্ধে পুনরুল্লেখ কেউ ভুলে করে ফেলতেন তা হ'লে অনেক সময় তার স্থলে মামদো ভূতের আবির্ভাব হয়ে যেতো।

অনেকে থাকে যাদের কোনও বিশেষ বিষয়, বিশেষ শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী বা বিশেষ প্রণালীর উপর একটা বিতৃষ্ণা থাকে যার জন্য সেই বিশেষ সময়টায়ই শুধু তার ঘাড়ে ভূত চাপে। বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথের বিষয় আমাদের সকলেরই জানা আছে যে বিশেষ শিক্ষকের উপর বিতৃষ্ণার দরুণ সেই শিক্ষকের ঘণ্টায় তাঁর ঘাড়ে কি রকম ভূত চাপতো যে রোজ তাঁকে রোদে এক পায় দাঁড় করিয়েও ভূত নামানো যায় নি।

আমার একটা ছাত্র লিখতে ভারী নারাজ ছিল। যখনি তাকে লিখতে বলা হ'ত, হয় সে ছবি আঁকতো, নৈলে দোয়াতের মধ্যে পাঁচটা আঙুল ডুবিয়ে কাপড়, জামা, ডেস্ক, খাতা বই সব কালীময় করে তুলতো। বেচারাকে এইজন্য অত্যন্ত শাস্তিভোগ করতে হ'তো। ক্লাশ শিক্ষয়িত্রী যখন না পেরে তাকে আমার কাছে নিয়ে এলেন তখন সে অত্যন্ত কাতর ভাবেই আমাকে জানালো যে লেখা কাজটা তাকে দিয়ে হতে পারে না। সে বেচারা লেখার হাত এড়াবার জন্য অসভ্য ভেদ্দা পর্য্যন্ত হ'তে রাজী ছিল। অথচ মৌখিক প্রশ্নোত্তরে সে বেশ ভালই ছিল, ছবিও আঁকতো ভাল।

এই পর্য্যায় ভুক্তরা কি কারণে সেই বিশেষ ব্যক্তি, বিষয় বা প্রণালীর উপর বিরক্ত হেইটা

বার করে সেই কারণটা দূর করলেই সব গোল চুকে যায়। শৈশবেই অঙ্কের শিক্ষয়িত্রীর কাছে শাস্তি পেয়ে অঙ্কশাস্ত্রের উপরই আমার বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল। কিন্তু উঁচু ক্লাশে এসে সহৃদয় অধ্যাপকের কাছে পড়তে গিয়ে সে বিতৃষ্ণা দূর হয়ে গিয়েছিল। আমার ভাইপোটী কোনও বিশেষ শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়তে অত্যন্ত নারাজ ছিল। তাঁর কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখলাম শিক্ষয়িত্রীর কোনই দোষ নাই—দোষ তাঁর কাজটার। তাঁর ক্লাশে, শোনা গল্প শিশুদের ফিরে বলবার নিয়ম; সে অত্যন্ত লাজুক (nervous), সে দশজনের সামনে কিছুতেই গল্প বলতে পারে না, কাজেই সে সেই শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়তে চায় না। প্রকৃতির অলসতার দরুণ যারা কিছুই করতে চায় না তাদেরকে যদি এটাই বারবার বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে তার দিক থেকেও নিজের কৌতূহল মিটাবার উপায় ভাববার চেষ্টা না হলে আমরাও তার কৌতূহল সর্ব্বদাই মিটাবার জন্য যত্ন কর্ব্ব না, তা হ'লে সে পড়াশুনার দিকে মন দেয়—কারণ শিশুচিত্ত যে স্বভাবতঃই কৌতূহলী এবং কৌতূহল মিটাবার চাবীকাঠি যে লেখাপড়া শেখা এটা জানলে সে আপনিই লেখাপড়ার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়বে।

অনেক শিশু থাকে যারা অত্যন্ত সপ্রতিভ, এরা কোনও একটা জিনিস জানে না এটা স্বীকার করতে লজ্জা পায়। যেখানে নিজের কর্ম্মবিমুখতার দরুণ এই না জানাটার উৎপত্তি সেখানে এই লজ্জা দ্বিগুণ কিন্তু এই লজ্জা স্বীকার করার মত পাপও বুঝি আর নাই তাই তাঁরা সবই জানেন। এই সবজান্তা শিশুগুলিকে এত জানার জন্য যদি বেত্রদণ্ড বা বকুনি দেওয়া যায় তা হলে শিশুর বর্ত্তমানে যতটা না অশ্রুবিসর্জ্জন ঘটে, ভবিষ্যতে, বোধ হয়, তার চেয়ে বেশী ঘটে; ফলে মানবসমাজ যে বিশেষ লাভবান হয়ে ওঠেন তাও নয়।

বঙ্গ সাহিত্যের তরুণ লেখকদের মধ্যে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ একজন বাল্যকালে আমার সহপাঠী ছিলেন। পড়ার চেয়ে খেলারদিকেই যে তাঁর মন বেশী ছিল তা আমি হলপ করে বলতে পারি, কারণ অনেক সময়েই তার খেলার সঙ্গিনী আমি থাকতাম। কিন্তু তিনি ছিলেন একটী প্রকৃতি-বাদ অভিধানবিশেষ। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই তাঁর জানা ছিল—কোন প্রশ্নেই তাঁকে ঠকান যেতো না। Wit এর প্রাচুর্য্য তাঁর ছেলেবেলাতেই ছিল—তাঁর উত্তরগুলো হতো বেশ সরেস। পাথার বাড়ি তাঁর মাঝে মাঝে লাভ হতো—কারো কারো কাছ থেকে। কিন্তু আমার আজ এটা অনেক সময়েই মনে হয় আমাদের ক্লাশের ভার যাঁর হাতে ছিল তিনি যদি সদা-প্রফুল্ল-সুরসিকচিত্ত না হতেন তো বঙ্গসাহিত্য আজ হয়তো এঁর লেখার স্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত থাকতেন।

অনেকে আবার থাকেন বাস্তবিক অলস প্রকৃতির; তার উপর বুদ্ধির মাত্রাটাও তাঁর পাত্রে জন্ম থেকেই কম পড়ে আছে। এমন লোকে যদি নিজেকে সব-জান্তা বিবেচনা করে না জেনেই উত্তর দিতে যায় ত তাঁদের উত্তর আমার পূর্ব্বোল্লিখিত বন্ধুটীর মত সরেশ না হয়ে হয়, হয় বাসী পচা, নয় একেবারে নিঃসার। এঁদেরকে পাখার বাড়ি দিয়ে থামানো যদিও আজকালকার দিনের চিন্তা এবং আদর্শের বিরোধী, তবুও শিক্ষা বিভাগের পিনাল কোডের অন্তর্গত একটা দণ্ডবিধি হয়ে যায় বলে মনটা যেন চাইতে থাকে, কারণ তাদের সেই অতিরিক্ত কথা বলার ঝুঁকীটা যে বইতে হয় আমাদেরই, আর

সে সময়ে মনস্থির রেখে নৈতিক বল প্রয়োগ করা যে কি আয়াসসাধ্য তা ভুক্তভোগীই বোঝেন।'

আমি জানি, একটী ছোট মেয়েকে যে ঐ রকম অর্থহীন উত্তর দিত, কিন্তু কিছুতেই উত্তর দেওয়া ছাড়ত না। তাকে নিয়ে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরাই যে শুধু মজা দেখ্‌তেন তা নয়, আমরা ছাত্রীরাও দেখ্‌তাম। আমাদের এক উগ্রমূর্ত্তি পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে কঠিন রকমের দুই ধমক খেয়ে কিন্তু মেয়েটীর এই ব্যারাম সেরে গিয়েছিল।

প্রায় প্রত্যেক শিক্ষাপীঠেই এমন এক জনকে পাওয়া যায় যে অপরকে বেদনা দিতেই ভালবাসে, আঘাতের উপর আঘাত সে দিয়ে যায় যাকেই সামনে পায় তাকে, সে সমপাঠীই হোক আর শিক্ষাদাতাই হো'ন্। জলন্ত অগ্নিশিখা সে, দুর্দ্দম ঝড় সে, সে বিদ্রোহী; নিয়ম কানুন সে জানে না। একে লক্ষ্য করে দেখ্‌তে হয় কারণ এর মধ্যেও দুটা প্রকৃতি লক্ষিত হয়ে থাকে। এক প্রকৃতি থাকে যে আঘাত দেয় অপরকে, দিয়ে আনন্দ পায় কিন্তু নিজে আঘাত পেতে চায় না; বেদনাকে বড়ই ডরায়। এ হ'ল ইংরাজীতে যাকে বলে bully এ হ'ল moral coward, এর নিজের বেদনার ভয়ই একে নির্ম্মম করে তোলে। পাখীর ঠ্যাং ছিড়ে, ব্যাঙকে খোঁচা মেরে, রোগা ছেলে বা মেয়েটিকে মেরে ধরে কাঁদিয়ে এর আনন্দ। একে ধরে নিয়ে এসে "ছিঃ বাবা, এ বড় অন্যায়" বলে, বা ঘরে বন্ধ করে সঙ্গে বসে চোখের জলে ভেসে তিন ঘণ্টা উপাসনা করলে বিশেষ কোনও ফল লাভ হয় না। এর উপর সেই সনাতন নিয়ম প্রয়োগ করতে হয় "অপরের নিকট হইতে তুমি যেরূপ প্রত্যাশা কর, অপরের সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার কর।"

আমি একজনকে জানি যে এই রকম নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল, সে নির্ব্বাক জন্তু আর দুর্ব্বল শিশুদের নানারকমে কষ্ট দিত। একদিন সে একটা ব্যাঙের পিছনের পা দুটা ধরে তাকে জরাসন্ধের মত চিরে ফেল্‌ছিল দেখে, তার চেয়ে শক্তিশালী এবং বড় দুতিন জন যখন তাকে ধরে ঐরকম চিরে ফেল্‌বার ভয় দেখালেন তখন তার ভয় জনিত যে ভীষণ আর্ত্তনাদ শুনেছিলাম তা মনে হ'লে আজও তার উপর আমার মনে অবজ্ঞার ভাব জেগে ওঠে। কিন্তু এই ভয় দেখানোর পর সে আর অন্যের উপর অত্যাচার করে নাই।

যে শিশু অপরকে বেদনা দিয়ে নিজে বেদনা পায় তবুও অপরকে বেদনা দিতে ছাড়ে না—সে নিজের বেদনা পাবার লোভেই অমন করে থাকে কারণ বেদনাতেই তার আনন্দ। এরা হ'ল প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহী বার্ণাড শ'এর পুরুষ চরিত্র—নীটসের অতিমানুষ। এদেরকে গড়ে তোলা সাধারণ শিক্ষাপীঠের, অতি সাধারণ আমাদের কাজ নয় বলেই আমার মনে হয়, এদের জন্য আলাদা শিক্ষার বন্দোবস্ত হ'লেই যেন ভাল হয়।

যারা অপরকে বেদনা দিতে চায় না অথচ না বুঝে বেদনা দেয়, তাদেরকে নিয়ে চোখের জলে ভেসে উপাসনা কর্‌লে খুবই সুফল দেখা যায়, তাতে সন্দেহ নাই। প্রেমেতে জগাই মাধাই উদ্ধার হয়েছিলেন, মায়ের অশ্রুজলে সেন্ট অগষ্টীন বনেছিলেন ছোট শিশু কোন ছার।

অনেক শিশু আছে যারা বেদনা দিতে এবং বেদনা পেতে চায় না তারা দুটাকেই ভয় পায়। এরা প্রায়ই দুর্ব্বল দেহ, ক্ষীণ ধাতুর। এদেরকে সামান্য অপরাধ বা ত্রুটির

জন্য কঠিন শাস্তি দিলে এরা অনেক সময়ে এত ভীরু প্রকৃতির হয়ে ওঠে যে মিথ্যা দ্বারা সামান্য ত্রুটি বা বড় সব কিছুকেই গোপন কর্‌তে চায়। তার ভুলের চেয়ে তার মিথ্যা আচরণটাই যে আমাকে বেশী পীড়া দিচ্ছে এইটাই তার কাছে পরিস্ফুট করে দেওয়া দরকার। এদের কাছে আমার চোখের জলের উপকারিতা আছে বলে যে সকলের কাছেই থাক্‌বে এই বিবেচনাটাই ভুল।

দুর্ব্বল দেহ হলেই যে মন দুর্ব্বল হবে এটা অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নয়। রোগা দেহের মধ্যেও এমন সতেজ মন হয় যে রকমটা সুগঠিত দেহের মধ্যেও অনেক সময় দেখা যায় না। কার জানি জীবনচরিতে পড়েছিলুম তিনি ছিলেন খুব রোগা, ছোট্ট খাট্ট, পাৎলা ছেলেটী। তাঁর স্কুলের একটী মাংসল, পেশীবহুল বড় ছেলে আরেকটী অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ছোট ছেলেকে মেরে ধরে তার খাবার না খেলার সরঞ্জাম কি যেন একটা কেড়ে নিচ্ছিলেন। তিনি এ অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে না পেরে বড় ছেলেটিকে এমন দমাদম মার দিয়ে ছিলেন যে বড় ছেলেটা অবাক হয়ে গিয়েছিল। বড় ছেলেটার কাছে মার খেয়ে তাঁর নাক মুখ ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি তাতে দমেন নাই, বলেছিলেন "এর পরও যদি তুমি এমনি কর তো তোমার হাড় গোড় ভেঙ্গে দিব।" এ প্রকৃতির শিশুর কাছে অশ্রুপাতে লাভ হয় না, দুঃখ বহন কর্‌বার শক্তি আমার আছে এইটা দেখানোতেই ফল পাওয়া যায়। অশ্রুপাতকে এরা মনে মনে অবজ্ঞা করে থাকে, এরা কারোও দ্বারে ভিখারী হতে চায় না; এরা জিনে নিতে চায়, সাহস ও শৌর্য্য দিয়ে, এরা চায় যে অপরেও এদের কাছ থেকে জয় করে নেয় এদের চিত্তখানি।

এই প্রকৃতির শিশুরাই সবল দেহ হোক দুর্ব্বলদেহ হোক্, অন্যায় করে দণ্ডকে নিতে ভয় পায় না বরং দণ্ড চায় এবং না পেলে মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। এদের ভুল ত্রুটির ও ফল ও অবশ্যম্ভাবী মনে করেই এরা তাকে প্রত্যাশা করে থাকে এবং পার্‌লে জোর করেই তাকে ঘাড়ে পেতে নেয়।

আমি জানি একজনকে যিনি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর দেবার সময় পাচ্ছিলেন না বলে নিরীক্ষক (guard)দের অজ্ঞাত সারে বই দেখে প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। সমস্ত উত্তরই কিছু তিনি বই দেখে লেখেন নাই; একটু খানি দেখে তার মনে এসেছিল জিনিষটা। তখন তিনি কিছু বলেন নাই কিন্তু অপরবেলায় তিনি প্রশ্ন পত্রের জবাব না দিয়েই উঠে এসেছিলেন, এই বলেই যে, "সকাল বেলা আমি বই না দেখ্‌লে উত্তর পত্র লিখ্‌তে পারতাম না। আমি বই দেখেছিলাম, তাই আমি এ বেলার উত্তর লিখ্‌ব না। আমার পাশ হওয়া তো ঠিক নয়।"

আর একটি ছোট মেয়ের কথা শুনেছি যে ছেলে বেলায় কালী ফেলে দিয়ে, মার সেলাই এর বাক্স থেকে ছুঁচ বা কাঁচি বিনানুমতিতে নিয়ে কোনও অনিষ্ট ঘটালে সে কেউ জেনে তাকে শাস্তি দেবার আগেই কোণে দাঁড়িয়ে শাস্তি নিত। সে নিজেকে শাস্তি দিতে খুবই রাজী ছিল।

এতো বিচিত্র মন নিয়ে যাদের কারবার তাদের যে মনস্তত্ব জানাই চাই একথা

জগতের সমস্ত platform থেকেই সকলকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। শুধু মনস্তত্ত্ব জান্‌লেই হবে না, শরীরের সঙ্গে মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার দরুণ, স্বাস্থ্যের উপর, ইন্দ্রিয় শক্তির উপর, মনন ও ধ্যানের, স্মৃতির ও কল্পনার নির্ভর থাকার দরুণ যে ছাত্রমন অলস বা কর্ম্মপটু হয় এটা জানিয়ে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও শারীর তত্ত্বেরও মোটামুটী জ্ঞান শিক্ষকতা ব্রত গ্রহণ করার পূর্ব্বে ব্রত-গ্রহণাকাঙ্ক্ষীকে দেওয়া উচিত।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

আমিত্ব।

ভুলে যাই পরমার্থে, ভুলি হিতাহিত
যাহার প্রতিষ্ঠা লাগি দ্বন্দ্ব করে মরি
(সে) আমিত্বের আদি কোথা, কোথা পরিণাম?
কিনারা কিছু না হয় যত চিন্তা করি।

এ বিশ্বজগৎ বাঁধা শক্তিসূত্রে তব
তোমার নিয়মে চলে এই চরাচর;
তোমার জগতে থেকে তোমারে ভুলিয়ে
আমার আমিত্ব লয়ে করি গণ্ডগোল!

বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট পুষ্ট তব প্রেমে
নগণ্য মানব আমি কেবা তার মাঝে?
তবু সে আমিত্ব মোরে রাখে যে ভুলায়ে
পাই না তোমারে ভ্রান্তি মুগ্ধ-চিত্ত মাঝে।

চাহি নাক সে আমিত্ব মিশে যাই আমি
অনন্ত বিস্তীর্ণ তব প্রেমের সাগরে।

বায়ুগণ তার কাজ আছে এ জগতে,
বারিবিন্দু কত প্রাণ বাঁচায় সংসারে।

আত্ম-অভিমান লয়ে ফিরিয়া দাঁড়াই।
তোমার সন্তান এবং তোমা হতে দূরে।
এই কি আমিত্ব? যাহা রোধে তব পথ?
তোমার সন্তান এত হীন হ'তে পারে?

অসম্ভব। এ যে শুধু বাহ্য আবরণ
অন্ধতা তিমির ইহা, পলকের ভ্রম,
আমিত্বের বিকৃতি এ কলুষতা মাখা;
আমি নহি, 'আমি' কিগো এতই অধম?

ক্ষুদ্র হই তুচ্ছ হই, তোমারি সন্তান
একথা যেন না ভুলি জীবনে মরণে;
ছোট প্রাণ বড় হবে গ্লানি দূরে যাবে
আমার সর্ব্বস্ব তুমি জাগিবে পরাণে।

শ্রীপুণ্যপ্রভা ঘোষ।

সাহিত্য ও তাহার বিচার।

ছেলেবেলা থেকেই আমাদের কিছু কিছু ভাব থাকে, অতি অল্প বয়সেও আমরা ছবি দেখে সুখ পাই, মা'র কাছে থেকে আনন্দ পাই ও নানা রকমে আমাদের মধ্যে যে ভাব আছে, তাহা জানাবার চেষ্টা করি। শিশু যখন একটু বড় হয় তখন তার ভাব অনেক রকম করে নিজের পরিচয় দেবার চেষ্টা করে ও শিশু তখন ভূত পরীর দেশের রাক্ষস খোক্কসদের সঙ্গে খেলা করতে ভাল বাসে। তার কল্পনা জগতের এই জিনিষ গুলার মধ্যে একটু নূতনত্ব খুঁজে বেড়ায়, সত্যের বাঁধ ভেঙ্গে তার হৃদয় সেইজন্য অচিন দেশের তেপান্তর মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় ও তার সুন্দর সৌন্দর্য্য তৃষ্ণায় আকৃষ্ট হইয়া নানা রকমে নানা অদ্ভুত খেয়ালের মধ্য দিয়া নিজের পিপাসা নিবৃত্ত করে। শিশুর এই যে আনন্দ তার মধ্যে সত্য উপলব্ধি করার প্রয়াস মোটে নাই, তার মধ্যে আছে তার কল্পনার অবাধস্ফুরণ ও তার হৃদয়ের উদ্দাম আবেগ।

শিশু যখন বড় হয় তখনও তার এ প্রবৃত্তি যায় না। তার কল্পনা পৃথিবীর কঠোর সত্যের সঙ্গে অনেক দিন ধরে লড়াই করে; তার ভাবগুলি পৃথিবীর জড় সত্যের কাছে অনেক বার ধাক্কা খায়, তবুও তাহার হৃদয় অনেক প্রকারে নিজের আবেগ রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হয়! একদিকে জড় সত্য, অন্যদিকে জ্ঞান তাহার মনের কল্পনা ও প্রাণের ইচ্ছা এ দুয়ের মধ্যে খালি ক'দিন ধরে খুব যুদ্ধ চলে কিন্তু দুইই প্রবল, সেইজন্য কেউ কাহাকেও একেবারে বিনাশ করতে সক্ষম হয় না। তখন দুয়ের মধ্যে একটা রফা হয় ও যে কল্পনা তাহার ছেলেবেলায় সত্যের কোন ধার ধারত না, যা নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীকে লঙ্ঘন করে অক্লেশে পরীরাজ্যে পৌঁছে যেত, তা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হয়ে জড় সত্যকে আশ্রয় করে জড় বস্তুর মধ্যে দিয়ে, জড় জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে, বিজ্ঞানের নিয়ম রক্ষা করে জ্ঞাতর মধ্য দিয়ে অজ্ঞাতকে জানার চেষ্টা করে, রূপের মধ্য দিয়ে অরূপকে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করে ও জড়ের মধ্য দিয়ে নানা প্রকার ভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। যে পরীর বিষয় ভাবতে শিশু আনন্দে আত্মহারা হ'ত তার ডানা কেটে তাকে তখন উপন্যাসের বন চিত্র আয়েষা মোহিনী ক'রে খাড়া করে।

এই কল্পনাই বিকাশ লাভ করে রস সাহিত্য হয়ে দাড়ায়। আমাদের একটা হৃদয় আছে, আমরা কেবল মাত্র নীরস কঠোর বিজ্ঞানের দ্বারা আনন্দ পাই না, আমরা জড় বস্তুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি, সেই জন্য এই বাস্তব জগত থেকে বেরিয়ে, জড় বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস ভুলে নিজের কল্পনাবলে কিছু আনন্দ পেতে চেষ্টা করি। নিজের জীবনগত রসকে বুঝতে প্রয়াসী হই ও আমাদের অন্তরস্থ আনন্দ ধারার চরিতার্থতার চেষ্টা করি। মানবের এই আকাঙ্ক্ষা আছে বলেই সে সাহিত্য সৃজন করে ও সাহিত্যের রসধারায় বিভোর হয়।* সাহিত্যে আমরা বৈজ্ঞানিক সত্যকে খুঁজি না, স্বরূপের চিন্তা করি না,

* কটক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত।

ভূয়োদর্শনের যথাযথ বিন্যাস করি না, আমরা কল্পনার দ্বারা প্রকৃতির সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করতে চেষ্টা করি, মানব জীবনের লক্ষ্য বিচার না করে তাহার সহস্র বিভিন্ন আকার দেখতে চেষ্টা করি ও নানা প্রকার ঘটনাস্রোতের মধ্যে মানবজীবনকে দেখতে প্রয়াস পাই। এই কল্পনা ছাড়া সাহিত্য থাকতে পারে না। ইহাই সাহিত্যের প্রাণ। কিন্তু এই কল্পনা সত্যকে আশ্রয় করে চলে। মানুষ নিজে জ্ঞানের গরিমা করে, নিজের বুদ্ধির উপরে তাহার অগাধ বিশ্বাস, সেইজন্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে সে কোন জিনিষকে ভালবাসতে পারে না।

অট্টালিকা যত মনোহর হউক, তার মধ্যে যত সাজ সরঞ্জাম থাকুক, নানা রকম রং দিয়ে তাকে যত সুন্দর করবার চেষ্টা হউক তার ভিত্তি থাকবে কঠোর পাথরের উপর, তা না হলে অট্টালিকা পড়ে যাবে, তার সাজসরঞ্জামগুলি ধুলায় লুটিয়ে, নিজের সৌন্দর্য্য হারিয়ে, পরের উপহাসাস্পদ হবে। সাহিত্য ক্ষেত্রেও ঠিক এই কথা খাটে। কল্পনা যত মনোমুগ্ধকর হোক না কেন, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস এ সকলের সিদ্ধান্ত গুলির বিপক্ষে দাঁড়ায়, তাহা এ জগতের লোকের কাছে আদরণীয় হয় না। আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সেইজন্য সাহিত্যের বিপর্য্যয় ঘটছে। গাছ পালার মধ্যে পুরাতন গ্রীকেরা বনদেবীগণের ক্রীড়া দেখত ও প্রকৃতির সর্ব্বত্র দেবদেবীগণের সত্তা কল্পনা করত, সাগরের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে জলের অজ্ঞাত ক্ষমতায় সশঙ্ক হয়ে তাহাদের পূজা করত, সে কাল আর নাই।

আজকাল খুব ঘন জঙ্গল না হলে দৈত্যের কল্পনা চলে না, নদীকূলের শ্যামল তরুরাজির ঘন সন্নিবেশের মধ্যে পুষ্পবীথির কল্পনা না কর্লে তার মধ্যে জলদেবীকে আসন দেওয়া অসম্ভব হয়।

ক্রমে ক্রমে যতই জ্ঞান বাড়ছে, কল্পনা রাজ্য একধার থেকে সঙ্কুচিত হচ্ছে ও তার রাজ্য অন্য ধারে বিস্তৃত হইলেও আগেকার সর্ব্বব্যাপী শক্তি আর তার নাই। যুগবিপর্য্যয়ে নববিভাসিত সত্যকে আশ্রয় করে তাকে চলতে হবে ও জ্ঞান রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলেও তার নিয়ম লঙ্ঘন করে চলতে পারবে না।

সাহিত্য, আনন্দের উপর, সৌন্দর্য্য তৃষ্ণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যের ক্ষমতা অসীম, মানব জীবনের উপর তার প্রভাব খুব বেশী; আনন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই, উপভোগের বস্তু বলিয়াই তার এতখানি প্রভাব ও এতখানি মনোমোহিনী শক্তি। এই শক্তি যদি পাপমার্গে পরিচালিত হয় তাহলে সমাজে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়, সমাজ ক্রমশঃ অবশ হয়ে পড়ে। সেই জন্য সাহিত্যের বিচার আবশ্যক হয়।

পাছে সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, সেইজন্য বিচারকেরা সাহিত্যের প্রভাবকে সমাজের হিতসাধনে, মানব জীবনের পরিপূর্ণতা সম্পাদনে নিযুক্ত করবার চেষ্টা করেন ও যে সাহিত্যের মধ্যে সমাজের অহিতকর কিছু থাকে তাকে লাঞ্ছনা করে দমন করবার চেষ্টা করেন। সেইজন্য সাহিত্যের বিচার সমাজের আবশ্যক হয়ে ওঠে ও বিচারকের আসন সমাজে পূজনীয় হয়।

কিন্তু বিচারকেরা সব সময়ে সমাজের মঙ্গলের উপর লক্ষ্য রেখে বিচারে প্রবৃত্ত হন না। বিচারকেরা অনেক সময় নিজের খেয়ালে নিজে মাপ কাঠি গড়ে নিয়ে সাহিত্যের বিচারে প্রবৃত্ত হন। সেই জন্য সাহিত্যের নানাপ্রকার বিচার আমরা দেখ্‌তে পাই ও এই সব বিচার সাহিত্যকে অনেক সময় ম্লান করে ফেলে।

একদল বিচারক আছেন তাঁরা দেশ কাল পাত্র বিচার করে সাহিত্যের আদর্শ নির্ণয় করেন, আর একদল কেবল ভাষার বিচার করেন, কেউ কেউ বা কোন পুস্তকের ভাবের সত্যাসত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন আর কোন্ কোন্ কবি কোথা থেকে কোন্ ভাব চুরী করেছে ও তার ভাবের মূল কোথায় এই সব দেখেন। কোন কোন বিচারক সাহিত্যিকদের মধ্যে কবির স্থান কোথায় তাই নির্দ্দেশ করতে প্রবৃত্ত হন ও অপর একদল পরবর্ত্তী সাহিত্যিকদের উপরে কবির প্রভাব কতটা বিস্তৃত তা ছাড়া আর কিছু দেখেন না। এই রকম নানা প্রকারের মাপকাঠি আছে ও বিচারকেরা সাহিত্যকে নানা রকমে বিচার কর্ত্তে প্রবৃত্ত হন। যাঁরা দেশ কাল পাত্র অনুসারে বিচার করেন তাঁরা ভাবের চির সৌন্দর্য্য ভাষার সুঠাম লালিত্য প্রভৃতি আনন্দের উপাদান বিস্মৃত হয়ে সমাজের অভাব ও ব্যক্তিগত সৌন্দর্য্যকে লক্ষ্য রেখে সাহিত্যের বিচারে প্রবৃত্ত হন ও তাহাদের উদ্দেশ্য ভাল হলেও এবং এই রকম বিচারে সাহিত্যের উন্নতি সাধন হলেও এ রকম বিচারকে শেষ বিচার বলে কখনও গ্রহণ করা যেতে পারে না। যখন এদেশে সাহিত্য ছিল না তখন টেকচাঁদ ঠাকুরের "আলালের ঘরে দুলাল" ও "আপনার মুখ আপনি দেখ" প্রভৃতি খুব আদরণীয় হয়েছিল ও তারা সমাজের উন্নতিকল্পে ও সমাজের দোষ নিরাকরণের জন্য যে সাহায্য করেছিল তা নিতান্ত অল্প নয়। কিন্তু আজকাল তারা বিস্মৃতির গর্ভে লীন ও বঙ্গ সাহিত্যের এই উন্নতির দিনে কেউ আর তাদের আদর করে না।

আজকে যেটা ভাল সেটা যে চিরকালই ভাল থাকবে, আজকে যেটা আমার প্রয়োজন সেটা যে আমি কখনও লাভ করতে পারব না, আজকে সমাজে যে সব কুরীতিগুলি বর্ত্তমান সে গুলো যে অনন্তকাল সমাজের বক্ষে তাণ্ডব নৃত্য করতে থাকবে সে কথা আমরা বলতে পারি না। সেই জন্য সাহিত্যের যে বিভাগের অভাব ছিল সমাজের যাহা প্রয়োজন, তাহা পূরণ কর্ত্তে যে মহাত্মা অগ্রসর হয়েছেন তাঁকে আমরা পূজা ভক্তি শ্রদ্ধা করতে পারি সাহিত্যের ও সমাজের হিতকারী বলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকতে পারি কিন্তু তাঁর রচিত পুস্তককে কেবল সেইজন্য সাহিত্যের উচ্চ আসনে বসাতে অক্ষম, সেইজন্যে এ প্রকার বিচার সাহিত্য ক্ষেত্রে চলে না। সৌন্দর্য্যসৃষ্টি যার উদ্দেশ্য, অনন্ত আনন্দ দান যার লক্ষ্য, বিশ্ব মানবের হৃদয়ের স্পন্দন অভিব্যক্ত করা যার আদর্শ, তার সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ বিচার করা নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য।

যাঁরা সাহিত্যে কেবল ভাষার বিচার করেন ও ভাবের সত্যাসত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন তাঁদের বিচারও শেষ বিচার বলা যেতে পারে না। আমরা সাহিত্য পাঠে যে আনন্দ পাই তা কি কেবল ভাষার লালিত্য, রচনার সৌষ্ঠব অথবা ভাবের সত্যাসত্যের উপর নির্ভর করে? চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ভাষা কঠিন, বাউলদের ভাষা অবোধ্য; তাই বলে কি তা

থেকে আমরা আনন্দ পাই না? যাহা কল্পনার বস্তু যাহা হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে নিজের প্রভাব বিস্তার করে তার বিচার কেবল বাইরের সৌষ্ঠব থেকে হয় না। এই বাইরের সৌষ্ঠবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই (Augustan) অগষ্টান যুগের সাহিত্যিকেরা নিজের কবিতাকে প্রাণহীন করে ফেলেছিল। ও এই ভাবের সত্যাসত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল বলেই (Cowley) কাউলির কবিতাগুলি আজকাল অপাঠ্য। সত্যাসত্য বিজ্ঞানের জিনিষ, আনন্দের বা কল্পনার জিনিষ নয় সেইজন্য সাহিত্যকে এদিক থেকে বিচার করা চলে না। অবশ্য কবির ভাব থাকা চাই ও সেই ভাব প্রাণস্পর্শী ভাষায় নিজের আবেগ ব্যক্ত করে পাঠকের চিত্তবৃত্তিকে আন্দোলিত কর্ত্তে সক্ষম হওয়া চাই। কিন্তু তাই বলে ভাবটা সত্য কি অসত্য ও ভাষা কোমল কি কঠিন কেবল সেইটুকু লক্ষ্য রেখে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা। তা না হলে বিচারকের এক কথায় ছেলেদের পরীরাজ্য ভূমিসাৎ হয়ে যাবে ও রবিবাবুর "গীতাঞ্জলি" অপাঠ্য হয়ে উঠবে।

কেউ কেউ সাহিত্যের মধ্যে চুরী ধরতে বড় মজবুত। আর এই চুরী ধরাও বড় বিশেষ শক্ত কাজ নয়। কিছুদিন আগে বাংলার কোন্ কোন্ কবি ইংরাজী সাহিত্যের কি কি চুরি করেছেন সেই নিয়ে মহা আন্দোলন হয়ে ছিল ও Keats, Shellyর কবিতার ছড়াছড়ি বাংলার প্রত্যেক মাসিক পত্রিকায় দেখা যেত। যখন যখন শোকহীন হৃদিহীন সুখস্বর্গ ভূমি ছেড়ে বিলমাত্র জননী ... দেবের স্বর্গ খণ্ডগুলির প্রতি ধাবিত হ'ল দুঃখাতুরা মাতৃভূমি মর্ত্যভূমিকে নিজের নন্দন বনে পরিণত করতে ছুটল, তখন বিচারকেরা তার মহান্ ভাবের প্রতি লক্ষ্য না রেখে প্রাণস্পর্শী গভীর মানবিকতার প্রভাবে অভিভূত না হয়ে রায় দিলেন এটা (Browning) ব্রাউনিং থেকে চুরি, আর ব্রাউনিং তার ভাবটা "হেগেল" থেকে নিয়েছেন ও এই ভাব Goldsmith এর Vision of Asemতে বর্ত্তমান। কিন্তু এরকম সমালোচনার দোষ হচ্ছে এই যে, ইহাতে বিচারক সাহিত্যকে উপভোগের বস্তু বলে মনে করেন না, কল্পনার সৌন্দর্য্যের আনন্দ পান না, কলাবিদ্যার সৌষ্ঠবে মুগ্ধ হন না। তিনি চান নিজের জ্ঞান দেখাতে ও লোকদিগকে নিজের জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে তাদের কাছ থেকে বাহবা আদায় কর্ত্তে। তার হৃদয়ে সাহিত্য উপভোগ করবার ক্ষমতা নাই, সরস সুন্দর বস্তু তাতে প্রতিফলিত হয় না, কল্পনার আনন্দ তাতে পৌঁছে না, সেইজন্য বিশ্বমানবের কাছে তার বিচারের কোন মূল্য নাই। পৃথিবীর কাছে সাহিত্য রসিক বলে তার গর্ব্ব করা অসম্ভব।

সাহিত্য ভোগের জিনিষ; আনন্দ থেকে তার জন্ম, আবেগ তার প্রাণ, ও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিতে তার পরিণতি! এহেন সাহিত্যকে বিচার করা অরসিকের কর্ম্ম নয়, কোন বাঁধা মাপকাঠির দ্বারা তার বিচার চলে না, তার সম্বন্ধে কোন নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যেতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার ভাবে তার স্ফুরণ, সেইজন্যে আর সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম জারি করা মোটেই সম্ভব নয়।

সহিত শব্দ থেকে সাহিত্যের উৎপত্তি। প্রাণের সহিত, বিশ্ব মানবের সহিত, গাছ পাথর লতা পাতা বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের সহিত যার প্রাণের যোগ আছে, প্রাণের সহিত ও জগন্নিয়ন্তার সহিত যার সংস্পর্শ আছে, তাহাই সাহিত্য। সেই জন্য সাহিত্যের মধ্যে

বিশ্ব মানবের পরিচয় পাওয়া চাই, কোনও সমাজ কোনও ব্যক্তি কোনও ক্ষুদ্র দেশের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে তাকে বিশ্ব মানবের বিশ্ব প্রকৃতির অনন্ত ভাবরাশি পরিস্ফুট ভাবে প্রতিফলিত করতে হবে, তা না হ'লে তার নিজের উদ্দেশ্য সে কখনও সাধন করতে পারবে না! এই যে অনন্ত সুন্দরের বিকাশ সাহিত্যের মধ্যে তার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, সাহিত্যকে বিচার কোর্ত্তে গেলে এই জিনিষটার উপরেই প্রথম লক্ষ্য দিতে হবে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাহিত্যিক নিজে বিশ্ব জগৎকে বুঝতে না পেরে তার ছোট ছোট খণ্ডগুলি নিয়ে খেলা করে ততক্ষণ তার লেখা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হয়ে উঠে না ও তা পড়ে মানুষের আশা মেটে না। মোট কথা এই যে, সাহিত্যিক নিজের যে আবেগ পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করচে, যে ভাবের অভিব্যক্তি দ্বারা নিজে আনন্দ পেয়ে পরকে আনন্দিত করতে চেষ্টা করছে, তাকে বিচার কোর্ত্তে হবে সেই ভাবের উপর দিয়ে ও তাকে বুঝতে হবে সেই অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে। সেইজন্য যতক্ষণ কবি নিজে ক্ষুদ্র থেকে সঙ্কীর্ণ ভাবের মধ্য দিয়ে নিজের অসম্পূর্ণতাকে জগতের সামনে ধরে, ততক্ষণ দেশ কাল পাত্র ইত্যাদি বিচারে উচ্চ স্থান পেলেও বিশ্ব মানবের কাছে তার স্থান উচ্চ নয়, ও সময়ের গতি তাকে কখনও অনন্তকাল বাঁচিয়ে রাখবে না। সাহিত্য যখন পর্য্যন্ত নিজেকে এই সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে তখন পর্য্যন্ত সে কবি হয় না কিন্তু যখনই অনন্ত আবেগের উদ্দাম উচ্ছ্বাসে নিজের ভাবগুলিকে সর্ব্বব্যাপী সনাতন করে তোলে তখনই তাহার কবি হওয়া সার্থক। সেইজন্যই Shellyর মতে কবি ভবিষ্যত বক্তা ও বিশ্বজগতের পুরোহিত।

ভাবের বিচার করতে গেলে তাহার সার্ব্বজনীনতার উপরেই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কিন্তু সাহিত্যের ভাবকে আরও দুই এক প্রকারে বিচার করা হয়ে থাকে, সাহিত্য মানুষের কাছে মানবজীবনের অথবা প্রকৃতি জগতের একটি নিখুঁত চিত্র ধরে। সেই জন্যে কেউ কেউ এই চিত্রকে আসলের সঙ্গে মিলিয়ে, কল্পনার বিচার করতে চায়। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে বস্তু সত্য নয়, সত্য হচ্ছে ভাব। সেইজন্যে কেবল আসলের সঙ্গে তুলনা করে বিচার করা চলে না। কিন্তু কবির ভাব জীবনকে বা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে কতটা সত্যভাবে বুঝেছে ও তাহার ভাবের মধ্যে এই সত্য কতখানি পরিস্ফুট, তার বিচার সাহিত্যে চলে। কারণ সাহিত্যিক যদি কোন এক বিশেষ সময়ের উত্তেজনায় পৃথিবীকে ভাল করে না জেনে, পৃথিবীর সমগ্র ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম না করে, জীবনের প্রাত্যহিকতার বিষয় না ভেবে সত্যজ্ঞান উপলব্ধি না করে, নিজের খেয়ালকে আবেগের ও উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সত্য বলে প্রকাশিত করে, তবে সে সাহিত্য মানব সমাজের চির আনন্দকর হ'তে পারে না। কোনটা একেবারে সত্য আমরা জানি না, জীবনের সমস্যার আজ পর্য্যন্ত কেউ যথাযথ ভাবে নিঃসন্দেহ ভাবে সমাধান করতে পারে নি, সেই জন্য কোনটা চিরসত্য কোনটা মিথ্যা সেটা না জানলেও জীবনের কোন ভাবটা আমাদের কাছে প্রীতিকর, শোক তাপ ক্লিষ্ট মানব জীবনের কোন্ ভাবটা সুখকর, কোন ভাব হৃদয় মনের বিকাশকর, সে বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু জ্ঞান আছে ও সেই জ্ঞান আছে বলেই আমরা সাহিত্যের মধ্যে আনন্দ

কাব্য ও সাহিত্য পড়ে শোক তাপ কষ্ট ভুলে সান্ত্বনা পেতে চাই, নিজের মনের প্রসার লাভ করতে চাই। যে কবি এই সান্ত্বনা দিতে পারে না, মনকে প্রসারিত করে তুলতে পারে না তাঁর লেখা কখনই উচ্চ নয় ও বিচারে তাকে আমরা উচ্চ আসন দিতে পারি না। অর্থাৎ সাহিত্যে সুন্দরটাই সত্য, সুন্দরের বাইরে যা কিছু, আনন্দের বাইরে যার সত্তা, সাহিত্যে তার স্থান নাই।

সাহিত্যের ভাবের মধ্যে আমরা আরও চাই ধর্ম্ম, কিন্তু সাহিত্যের যে ধর্ম্ম সেটা সমাজের বাঁধন নয়, সেটা হৃদয়ের ধর্ম্ম। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিচার সামাজিক নিয়মের মধ্যদিয়া চলে না। হৃদয়ের যাহা ধর্ম্ম প্রাণের যাহা আবেগ তারি অভিব্যক্তি সাহিত্যে থাকে; সেই জন্যই সাহিত্যিক প্রেমের কাছে, ভক্তির কাছে, স্বদেশ প্রেমের কাছে, করুণার কাছে সমাজকে বলিদান দেয় ও সমাজের বাঁধন গুলি একে একে ছিন্ন করতে দ্বিধা মাত্র করে না। অবশ্য যে সাহিত্যিক মোহকে বড় আসন দেন, আমার ক্ষণিক আবেগকে বড় করে তোলেন, তাকে কখনও সমাজে উচ্চ আসন দেওয়া যেতে পারে না, কিন্তু ব্রাউনিং-এর youth and art-এর মত যারা সমাজ বন্ধনকে লঙ্ঘন করে, হৃদয়ের আবেগকে উঁচু করে তোলে, তারাই বাস্তবিক উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক। তাঁদের চিত্রগুলি সময়ের অপ্রতিহত প্রভাবকে পরাস্ত করে, অনন্তকাল মানব জীবনের, মানব হৃদয়ের আশা আবেগ আনন্দ বহন করে ধন্য হয়। সেইজন্য সাহিত্যের বিচার করতে গেলে conventional morality-র বিচার করা চলে না ও এই খানেই সাহিত্যিক নূতন moral standard সৃজন করিয়া সমাজের উপরে নিজের আসন স্থাপন করেন কলা বিদ্যার মাহাত্ম্য ব্যাখ্যান করেন।

কিন্তু সাহিত্যের বিচারে ভাষার বিচারও চাই। সাহিত্যিক যে ছবি আঁকেন তাহা জগৎকে পাঠকের হৃদয়ের সঙ্গে আনন্দের মধ্য দিয়ে পরিচিত করতে চেষ্টা করে, সেই জন্য বাস্তব জগতে যা সত্য, বিজ্ঞান যার নাগাল পায়, সেই জড় বস্তু সাহিত্যের অঙ্গীভূত নয়। সেই জন্য সাহিত্যের ভাষা ভাবের ভাষা, কল্পনার অভিব্যক্তি ও সেই জন্য সাহিত্যিক নানা কল্পনারঙ্গে সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়ে বস্তুর বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়। সমুদ্র কত গভীর, তার তরঙ্গ কত ফীট উঁচু, তার বিস্তৃতি কতখানি, সাহিত্যে এসব নীরস সত্য থাকে না, সেইজন্য সাহিত্যিক সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে যে বিরাট মূর্ত্তির কল্পনা করেন, তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে যে তাণ্ডব নৃত্যের আভাস পান, নীল সাগর জলের শুভ্র ফেনখণ্ড গুলির মধ্যে যে অপ্সরী দেখেন, তার বর্ণনা সাহিত্যের মধ্যে দিতে চেষ্টা করেন। সেইজন্যই সাহিত্যের ভাষা কল্পনায় অনুপ্রাণিত হয়ে বিজ্ঞানের ভাষার চেয়ে ভিন্ন আকার ধারণ করে। সমুদ্র দেখে তার হৃদয়ে যে ভাব জাত হয়েছে, সেই ভাবকে অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করাতেই সাহিত্যের সার্থকতা ও সেই ভাবকে অন্যের কাছে উপস্থিত করে তাকে সমুদ্রের সেই বিরাটরূপ দেখানই সাহিত্যিকের কার্য্য। এইটুকু করতে গেলে সাহিত্যিককে কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে ও নিজের ভাবকে কল্পনার দ্বারা বড় করে সাহিত্যের ভাষায় ব্যক্ত করতে হবে, সেইজন্য ভাষার বিচারে কল্পনার বিচার প্রয়োজন। যে সাহিত্যিকের ভাষা নিজের ভাবকে অন্যের কাছে যতখানি পরিস্ফুট করে তোলে নিজের আবেগকে অন্যের আবেগের উপাদান করতে পারে তার ভাষাই সাহিত্যে ততখানি উচ্চ আসন পাবার যোগ্য।

সেইজন্ত অনেকে সাহিত্যকে বিচার কত্তে কলম ধরলেন। সাহিত্যের প্রথম মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াল সত্য। এই মাপকাঠি নিয়ে বিচার আরম্ভ হওয়ার পর কল্পনার আর সে অবাধ গতি নাই, সেই জন্য কোন জিনিস দেখলেই মানুষ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করে এটা ঠিক কি না, অর্থাৎ মানুষের সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে তার দৈনন্দিন কার্য্য কলাপের সঙ্গে এর কতখানি সম্বন্ধ আছে? এ বিচার করা শক্ত নয়, কারণ জড় বস্তু ও জড় সত্য এদুটো প্রত্যেকেরই ভাল রকম জানা আছে ও এ দুটো নিয়ে বিচার আমরা জীবনে প্রায় সদা সর্ব্বদাই করে থাকি। সেইজন্য বিচারকের দল ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে লাগল ও সত্যের দোহাই দিয়ে তারা কল্পনাকে একেবারে কেটে ছেঁটে খাটো করে সাধারণ জীবনের নিত্য ঘটনার মধ্যে আবদ্ধ কোত্তে চেষ্টা করল।

কিন্তু কল্পনা ত সত্য নয়। সত্যের আশ্রয় নবে দাঁড়ালেও সেটা একটা আলাদা পদার্থ। সেইজন্য সত্যের মাপকাঠি নিয়ে কল্পনার বিচার করা চলে না। মানুষ চায় কল্পনা, সে নিত্য প্রাত্যহিক জীবনের ব্যাপার থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়, সেইজন্য নিছক সত্য কথা সে চায় না; তাতে তাহার প্রাণের পিপাসা মেটে না। সেইজন্য বিচারকদের এই মাপকাঠি এবার ভেঙ্গে গেল; সত্যের দোহাই দিয়ে কল্পনাকে আবদ্ধ করবার প্রয়াস তাদের ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সাহিত্য যদি কল্পনারই জিনিস হয় ও কল্পনাতেই যদি আমরা আনন্দ পাই তাহলে সাহিত্য উপভোগের জিনিস, বিচারের জিনিস নয়। আমরা সাহিত্য পড়ি, আনন্দ পেতে অর্থাৎ কল্পনাকে আশ্রয় করে, অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করে, অদৃষ্ট পূর্ব্ব সুখ পেতে জীবনের কঠোর সত্যগুলি ভুলে গিয়ে, মানব জীবনের লক্ষ্য ও গতির চিন্তা না করে, কেবল জীবনের বিকাশ দেখে ও প্রকৃতির সঙ্গে কল্পনা বলে নিজের ভাবের আদান প্রদান করে বিমল আনন্দ উপভোগ করতে। তাহলে সাহিত্যের মোটের উপর বিচারের বাইরে, সত্যাসত্যের বাইরে জড় বিজ্ঞানের বাইরে সাহিত্য ভাষার বিচারও চায়, এইজন্য যে কবি যে রস সৃজন করিতে চাহিতেছেন তাহার প্রকাশ হয় ভাষায়। যে রস মূর্ত্ত হইতে চাহিতেছে তাহার প্রকাশ কিরূপ সহজ হইয়াছে তাহাই ভাষা বিচারের একমাত্র মাপকাঠি।

সাহিত্য কল্পনার উপর আধষ্ঠিত বলিয়াই তার বিচার করা অত শক্ত ও আবেগের দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়াই কোনও আইন কানুন তার বেলায় খাটে না। আমরা বিচার করতে বসি আমাদের শিক্ষার গুণে ও আমরা আইন কানুন বাঁধি হৃদয়ের প্রবৃত্তি গুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে। আমরা প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করি না, মানবের হৃদয়কে বুঝবার আকাঙ্ক্ষা রাখি না, বিশ্বজগতের অংশ বলে, জগন্নিয়ন্তার সৃষ্টি বলে, নিজের পরিচয় দিতে পারি না, সেই জন্য ভাবরাজ্যের যা কিছু উঁচু, আনন্দের মধ্য দিয়ে, সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়ে, তাকে গ্রহণ করতে আমরা পারি না, সেই জন্য সাহিত্যকে বেঁধে, তাকে নিয়ম কানুনের অধীন করে, ছোট করে, আমরা দেখতে চাই ও তার মধ্যে যা কিছু মহান যা কিছু অনন্ত তার পরিচয় আমরা পাই না। সাহিত্যকে বিচার কোর্ত্তে হবে হৃদয়ের মধ্য দিয়ে, প্রাণের মধ্যদিয়ে ও বিশ্বমানবিকতার মধ্য দিয়ে; সাহিত্যের অন্যপ্রকার বিচার অসম্ভব ও বৃথা। উপভোগের বস্তু, আনন্দের আধার, সৌন্দর্য্যের আকর, তাকে জ্ঞানের মধ্য দিয়ে আইন